হংকং ভ্রমণ • কমিক্‌স • আমার ইচ্ছেমতো • নতুন খেলা
আনন্দমেলা
৫ অক্টোবর ২০২৩
৬ রকমের ৬টি গল্প
প্রচেত গুপ্ত
ইন্দ্রনীল সান্যাল
সৈকত মুখোপাধ্যায়
রাজশ্রী বসু অধিকারী
শুভমানস ঘোষ
সিজার বাগচী
আবোল তাবোলের শতবর্ষ নিয়ে লিখেছেন সন্দীপ রায়
খে লা ধু লো
ভারত কি বিশ্বকাপ জিতবে?
পোস্টার
বিশ্বকাপে ভারতের খেলা

আনন্দমেলা

কমিক্‌স

৪৯ বর্ষ ১১ সংখ্যা ৫ অক্টোবর ২০২৩ ১৮ আশ্বিন ১৪৩০

সূচিপত্র

৬টি ৬ রকমের গল্প

শান্তিবাবুর অশান্তি
প্রচেত গুপ্ত ৮

চন্দ্রগ্রহণের পরে
ইন্দ্রনীল সান্যাল ১৪

উড়ন্ত কফিন
সৈকত মুখোপাধ্যায় ১৮

সেই চাবির গোছাটা
রাজশ্রী বসু অধিকারী ২৪

খুব সাবধান
শুভমানস ঘোষ ৩২

জন্মদিনে বিভ্রাট
সিজার বাগচী ৪০
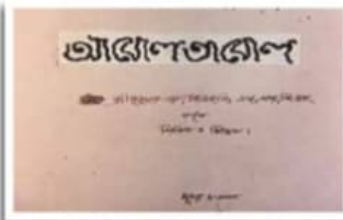
শতবর্ষ
আবোল তাবোল ১০০
সন্দীপ রায় ৬

ধারাবাহিক কমিক্‌স
রেডি-স্টেডি-গো ডিগবাজি
সুযোগ বন্দ্যোপাধ্যায় ৪৪

পোস্টার
বিশ্বকাপে ভারতের খেলা ৩০

দস্যি ডেনিস ৫

নিয়মিত বিভাগ
খুদে প্রতিভা ১২
আমার ছবি ২১
ফারাক পাও, সুদোকু ২২
আমার কুইজ় ২৩
আমার ইচ্ছেমতো ২৭
আমার স্কুল ২৮
শব্দসন্ধান, নিজের হাতে ৪৭
যা হয়েছে যা হবে ৫১
নতুন খেলা ৫৮

ধারাবাহিক কমিক্‌স
বাঘ ব্রহ্ম খেলা
রূপম ইসলাম ৪৮

বেড়ানো
হংকং শহরের গল্প
অর্পণ রায়চৌধুরী ৩৬

খেলাধুলো
বিশ্বজয়ের স্বপ্নপূরণের পথে এক ধাপ
সায়ক বসু ৫২

ছোট ছোট খেলা
চন্দন রুদ্র ৫৬

প্রচ্ছদ: প্রসেনজিৎ নাথ

সম্পাদক: সিজার বাগচী

এবিপি প্রাঃ লিমিটেডের পক্ষে প্রদীপ্ত বিশ্বাস কর্তৃক ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট কলকাতা ৭০০ ০০১ থেকে প্রকাশিত এবং আনন্দ অফসেট প্রাঃ লিমিটেড সি পি-৪, সেক্টর ফাইভ, সল্ট লেক সিটি, কলকাতা-৭০০০৯১ থেকে মুদ্রিত। বিমান মাশুল: আন্দামান, মণিপুর, অসম আর ত্রিপুরায় এক টাকা। পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা অধিকার অনুমোদিত। এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের বক্তব্য ও বিষয়বস্তু সম্পর্কিত কোনও দায় পত্রিকা কর্তৃপক্ষের নয়।

Edited by Caesar Bagchi and printed and published fortnightly by Pradipta Biswas on behalf of ABP Pvt. Ltd. 6, Prafulla Sarkar Street, Kolkata 700001. Printed at Ananda offset Pvt. Ltd., CP-4, Sector V Salt Lake City, Kolkata-700091

Year 49, Issue 11
RNI Regd No. 27057/75

আনন্দমেলা এ বার ওয়েবসাইটে: **www.anandamela.in**

দস্যি ডেনিস
'গুরু'তর খেলা

ওরে বাবা, আমার পিঠে কী যে ব্যথা!

আমার হাঁটুটা আমায় শেষ করে দিচ্ছে!

আমার আঙুলগুলোয় কী কষ্ট!

?
আমার ঘাড় সোজা হচ্ছে না-আ-আ...

তোমরা সবাই ভাল তো? কী হল তোমাদের বাচ্চারা?

আমরা এখন 'বড় হওয়া', 'বড় হওয়া' খেলছি।

সুকুমার রায়ের করা
প্রথম পাতার লেআউট

বইয়ের অলঙ্করণ

সুকুমার রায়

সন্দীপ রায়

আবোল তাবোল ১০০

দাদু সুকুমার রায়ের লেখা 'আবোল তাবোল'-এর শতবর্ষে স্মৃতিচারণ করলেন **সন্দীপ রায়**

আমার দাদু সুকুমার রায়ের লেখার সঙ্গে আমার পরিচয় ঠাকুরমার সূত্রে। ঠাকুরমাকে আমি দাদাভাই বলে ডাকতাম। আমাকে ঘুম পাড়ানোর সময় দাদাভাই যে সব গল্প-কবিতা বলতেন, তার সবই প্রায় ছিল সুকুমার রায় এবং উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর।

একটা কথা গোড়ায় বলে রাখা ভাল, আমি কিংবা আমার বাবা সত্যজিৎ রায়, কেউই দাদুকে সরাসরি পাইনি। বাবা যখন খুব ছোট, তখন দাদু মারা যান। তাই দু'জনের কাছে দাদু এসেছেন লেখালিখি এবং তাঁর কর্মকাণ্ডের সূত্রে। আর এসেছেন দাদাভাইয়ের সূত্রে। বাবা এবং আমি সেই সব গল্প পড়ে আবিষ্কার করেছিলাম সুকুমার রায়কে।

সুকুমার রায়ের যে লেখা শুনে আমার প্রথম ভাল লেগেছিল, সেটা ছিল 'হ য ব র ল'। 'আবোল তাবোল'-এর কবিতাও দাদাভাই বলতেন। কিন্তু সেটা বোঝার মতো বয়স তখনও আমার ছিল না। 'খিচুড়ি', 'শব্দ কল্প দ্রুম!', কিংবা 'গোঁফ চুরি'র মতো কবিতা ধরার জন্য পরিণত বুদ্ধির প্রয়োজন। ছোট বাচ্চার তো তা থাকে না। তখন হ য ব র ল-র মজা বেশি টানে। আবোল তাবোল পড়তে খারাপ লাগত না। কিন্তু মানে বোঝা মুশকিল ছিল।

আবোল তাবোলের মজা পেয়েছি আরও পরে। এক সময় দাদাভাই এবং মা বুঝতে পেরেছিলেন, এ বার আর-একটু পরিণত লেখাপত্র আমাকে পড়ানো দরকার। তখন আবোল তাবোল, খাই খাই-এর মতো বই দেওয়া হয়েছিল।

আবোল তাবোল এমন এক বই, যা এক এক বয়সে, এক এক ভাবে ভাল লাগে। ছোটবেলায় যখন পড়েছিলাম, তখন কবিতাগুলোর মানে এক রকম মনে হয়েছিল। আরও বড় হওয়ার পর একই কবিতা পড়তে গিয়ে দেখলাম, নতুন নতুন মানে খুঁজে পাচ্ছি। একেই বলে ক্লাসিক।

তবে কোন কবিতা থেকে ছোটবেলায় কী মজা পেয়েছি এবং বড় হয়ে আবার নতুন কী মানে আবিষ্কার করেছি, এত কথা বলতে গেলে মহাভারত হয়ে যাবে। পণ্ডিতেরা সেই সব কবিতা নিয়ে মস্ত মস্ত লেখা লিখেছেন। বই লিখেছেন। আমি আর নতুন কী বলব! শুধু বলতে চাই শেষ কবিতাটার কথা। কাব্যগ্রন্থের প্রথম এবং শেষ কবিতার নাম আবোল তাবোল। শেষ কবিতা লেখার সময় তিনি নিজেও বুঝতে পেরেছিলেন, দিন ফুরিয়ে আসছে। তাই সেই কবিতায় এমন কিছু লাইন লিখেছিলেন, যা আজও নাড়িয়ে দেয়। যেমন, 'আলোয় ঢাকা অন্ধকার,/ ঘণ্টা বাজে গন্ধে তার।/ গোপন প্রাণের স্বপন দূত,/ মঞ্চে নাচেন পঞ্চ ভূত!'

কী সহজ, কিন্তু কী গভীর! সেই জন্য একশো বছরেও বইটার জনপ্রিয়তা একটুও কমেনি। বরং বেড়ে চলেছে। মাঝে মাঝে ভাবি, কতখানি মুনশিয়ানা থাকলে এমন কবিতা লেখা যায়। কবিতার

মধ্যে মজা থাকবে, গভীরতা থাকবে, দর্শন থাকবে। তার পাশাপাশি সেটা ঠিক-ঠিক ফুটিয়ে তোলার জন্য দক্ষতারও প্রয়োজন। তবেই সেটা ধ্রুপদী সাহিত্য হবে। আমার মতে, এই ধরনের লেখায় সুকুমার রায়ের মতো দক্ষতা অন্য কারও ছিল না। হবে বলেও মনে হয় না।

দাদুর এত গল্প দাদাভাই আমাকে শুনিয়েছিলেন, কিন্তু কোনও দিন তাঁর সম্পর্কে একটা কথাও বলেননি। বাবাকে নিশ্চয়ই বলেছিলেন। সেই সব তথ্য বাবার কাজে লেগেছিল 'সুকুমার রায়' তথ্যচিত্র করার সময়। সেই তথ্যচিত্র দেখলে দাদুর কাজ এবং দর্শনকে বোঝা যায় ভাল ভাবে। তবে সুকুমার রায়কে এখনও আমরা আবিষ্কার করে চলেছি। তাঁর জাবদা খাতাগুলো রয়েছে আমার কাছে। সেই খাতার পাতা ওল্টালে চেনা যায় সুকুমার রায়ের জগৎ। আবোল তাবোল কোনও বিচ্ছিন্ন লেখা নয়। দাদু যেমন ভাবতেন, যেমন লিখতেন তারই একটা রূপ হল ওই কাব্যগ্রন্থ। সেই ভাবনা এবং লেখার পরিসর তো বিরাট। তিনি প্রিন্টিং টেকনোলজি নিয়ে কাজ করেছেন। হরফ নিয়ে কাজ করেছেন। পাশাপাশি পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন। ছবি এঁকেছেন। ননসেন্স কবিতা লিখেছেন। গল্প লিখেছেন।

আবোল তাবোলের প্রকাশ তিনি দেখে যেতে পারেননি। অসুস্থ অবস্থায় কাব্যগ্রন্থটির একটা ডামি কপি করে গিয়েছিলেন। সেই মতো ছাপা হয়েছিল। কবিতাগুলো প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল সন্দেশে। বই হওয়ার আগে কবিতাগুলোর কিছু সংশোধন তিনি করেছিলেন। সেই সব পাতা রাখা আছে। পাতাগুলো দেখে আশ্চর্য হয়ে যাই। অত অসুস্থ অবস্থায় মানুষটা কেমন করে অত কবিতা সংশোধন এবং অদলবদল করেছিলেন! বাবা যখন পার্থ বসুকে নিয়ে 'সুকুমার সাহিত্য সমগ্র' সম্পাদনা করেন, তখন আমাদের বাড়ির পরিবেশ হয়ে গিয়েছিল সুকুমার-ময়। সব সময় তাঁকে নিয়ে কথা হচ্ছে। তাঁর লেখা, ছবি দেখা হচ্ছে। ওই কাজ করার সময় বাবা খুব খেটেছিলেন। সম্পাদনার কাজটা ছিল তাঁর কাছে 'লেবার অফ লাভ'।

তবু দাদুকে নিয়ে আলাদা করে বাবা কখনও গল্প করেননি। শুধু নিজের কাজটুকু নিষ্ঠার সঙ্গে করে গিয়েছিলেন। এক এক সময় অবশ্য আক্ষেপ করতেন। দাদু এত অল্প বয়সে মারা যান যে, তাঁর বিশেষ কিছু রেখে দেওয়া সম্ভব হয়নি। বেশি ছবি নেই। যে সব কাজ করেছিলেন, তার অনেকটা তত দিনে হারিয়ে গিয়েছে। তথ্যচিত্র কিংবা লেখা সম্পাদনা করতে হলে তো অনেক জিনিসপত্র, তথ্য লাগে। সেই সব ছিল খুবই কম।

তবু আবোল তাবোল রয়ে গিয়েছে। এই কাব্যগ্রন্থের তুমুল জনপ্রিয়তার বড় কারণ হল, বাঙালি মেজাজ। এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। সেটা টের পাওয়া যায় কবিতাগুলো অনুবাদ করতে বসলে। বাবা অবশ্য কিছু কবিতা অনুবাদ করেছেন। সেই সব অনুবাদ প্রকাশিতও হয়েছে। কিন্তু তিনি পর্যন্ত আমাদের কাছে কবুল করেছেন, "এই কবিতা ইংরেজিতে অনুবাদ করা অসম্ভব। এটা ট্রান্সলেট করা যাবে না। ট্রান্সক্রিয়েট করতে হবে। তা না হলে লেখায় ওই মজা থাকবে না।"

এখানেই বোঝা যায় সুকুমার রায়ের কলমের স্বকীয়তা। বাঙালিয়ানা। কোনও অনুবাদেই তাঁর ওই মেজাজ পুরোপুরি আনা সম্ভব নয়।

এই বয়সেও আমি আবোল তাবোল পড়ি। চেনা কবিতা নতুন লাগে। আমার বিশ্বাস, শুধু একশো বছরেই নয়, আগামী একশো বছরেও এই বইয়ের কোনও বিকল্প দেখা যাবে না। আবোল তাবোল থেকে যাবে। এই কাব্যগ্রন্থ মিশে গিয়েছে বাঙালি-জীবনের সঙ্গে।

সাক্ষাৎকার ও অনুলিখন: সিজার বাগচী
সুকুমার রায়ের পাণ্ডুলিপি এবং লেআউটের ফটোর সৌজন্যে: রায় সোসাইটি

আবোল তাবোলের মূল পাণ্ডুলিপির তিনটে পাতা (উপরে ও নীচে)

শান্তিবাবুর অশান্তি

প্রচেত গুপ্ত

নিজের নামের উপর কি কারও রাগ হয়?

হতে পারে। নাম যদি পচেশ্বর প্রামাণিক বা গবেটচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় হয়, রাগ হতেই পারে। 'পচা' বা 'গবেট' এমন কোনও ভাল কথা নয় যে, সেই নাম পেয়ে আহ্লাদিত হতে হবে।

শান্তিবাবুর বেলায় ঘটনা উল্টো।

শান্তিবাবুর পুরো নাম শান্তি সান্যাল। কেউ ডাকে ‘শান্তিদা’, কেউ বলে ‘শান্তিবাবু’। ‘শান্তি’ একটা চমৎকার শব্দ। শুনলে মন ভরে যায়। শান্তিবাবু মানুষটাও তেমন। শান্তশিষ্ট, সুভদ্র। কোনও কাজের দায়িত্ব নিলে কখনও ফাঁকি দেন না। সকলেই তাঁকে পছন্দ করেন। সেই ছোট থেকেই শান্তিবাবুর এমন স্বভাব। এখন তাঁর বয়স আটচল্লিশ বছর হলেও স্বভাবে কোনও হেরফের ঘটেনি। সমস্যা ওই একটাই। নিজের নামটি নিয়ে কখনওসখনও বেজায় বিরক্ত হয়ে ওঠেন। এত বিরক্ত যে, মাঝে মধ্যে তাঁর মনে হয়, নামটা ছিঁড়ে কুটি কুটি করে ফেলে দিই। কিন্তু তা তো সম্ভব নয়। নাম তো কোনও কাগজ নয় যে, ছিঁড়ে কুটি কুটি করা যাবে। নাম-লেখা কাগজ ছেঁড়া যায়, শুধু নাম ছেঁড়া যায় না।

আইনে অবশ্য নাম বদলের ব্যবস্থা রয়েছে। সে কথা যে শান্তিবাবু এক–দু’ বার ভাবেননি, এমন নয়। তবে থমকে গিয়েছেন। বুঝেছিলেন, ওতে লাভ হবে না। ওতে শুধু খাতা-কলমের নামই বদলাবে, এত দিন ধরে লোকের মনে যে নাম গেঁথে গিয়েছে তা ওপড়ানো যাবে না। তা ছাড়া লোকে জিজ্ঞেস করলে কী বলবেন? যে কারণে তিনি নিজের চমৎকার নামের উপর খেপে যান, সেটা তো আর বলা যাবে না। লোকে অবাক হবে, হাসবে।

“ধুস, এ সব আপনার ছেলেমানুষি কথা। নামে কী আসে যায় শান্তিবাবু? শেক্সপিয়রসাহেব কী বলেছিলেন মনে নেই—‘হোয়াট্‌স ইন আ নেম?’ গোলাপকে যে নামেই ডাকা হোক, সে সুন্দর। সব নামই সুন্দর। আপনারও তা-ই। ও সব আপনার ভুল ভাবনা।”

এই কারণেই শান্তিবাবু কাউকে বলেন না, নিজেই নিষ্কৃতির পথ খোঁজেন। কিন্তু নিষ্কৃতি পাবেন কী করে, এই সমস্যার জন্য শান্তিবাবু নিজেই তো দায়ী। শুরু তিনি নিজেই করেছিলেন। তখন স্কুলে পড়েন, ক্লাস এইটে। পুজোর ছুটির আগে প্রতি বছর স্কুলে আন্তঃশ্রেণি ফুটবল টুর্নামেন্ট হয়। সেই টুর্নামেন্টের জন্য ছিল মস্ত আয়োজন। গোটা স্কুল উত্তেজনায় টগবগ করে ফুটত। ক্লাসে ক্লাসে টিম তৈরি নিয়ে হইচই চলত। যেহেতু এক ক্লাসের সঙ্গে আর-এক ক্লাসের ম্যাচ, মাস্টারমশাইরা এর মধ্যে ঢুকতেন না। শুধু দূর থেকে দেখতেন, টুর্নামেন্ট যাতে জমজমাট হয়। যারা জেতে, তাদের ক্লাসরুমে সারা বছর ট্রফি থাকে। টিমের সবাই একটা করে মেডেল পায়, ক্লাসের বাকি ছেলেরাও খালি হাতে বাড়ি ফেরে না। তারা পায় সার্টিফিকেট। তাতে লেখা থাকে—‘আমার ক্লাস এই বছর ফুটবল খেলায় বিদ্যালয়ের মধ্যে সেরা হয়েছে। আমি গর্বিত।’

এই সার্টিফিকেটের মধ্যে দিয়ে জয়ের আনন্দ সবাই ভাগ করে নেওয়ার মজা ছিল। অনেকে ফ্রেমে বাঁধিয়ে, বাড়িতে টাঙিয়েও রাখত। এই কারণে সকলেই চাইত, তাদের ক্লাসের টিম যেন পাকাপোক্ত হয়, ট্রফি জিতে আনে। সে বার ক্লাস এইটে টিম তৈরি নিয়ে লেগে গেল গোলমাল। ছেলেদের মধ্যে দুটো ভাগ হয়ে গেল। এক দল ‘অফেনসিভ’ মানে ‘আক্রমণাত্মক’ টিম চাইল, এক দল চায় ‘ডিফেনসিভ’, মানে ‘রক্ষণাত্মক’ টিম। প্রথম দল বলছে, তাদের বানানো টিমকেই মাঠে নামাতে হবে। জিততে গেলে আক্রমণ চাই। অন্যরা বলল, তারা যে টিম বানিয়েছে সেটাই উপযুক্ত। সেখানে রক্ষণভাগ শক্তিশালী। গোল বাঁচাতে না পারলে, গোল করে লাভ হবে না। বিপক্ষ দল গোল শোধ দিয়ে দেবে। এই নিয়ে ঝগড়া। শুধু ঝগড়া নয়, সেই সঙ্গে হাতাহাতির জোগাড়। অবস্থা এতটাই ঘোরালো হয়ে গেল যে ভয় হল, ক্লাস এইট বোধ হয় এ বছর টুর্নামেন্টে যোগ দিতে পারবে না। এই অবস্থায় ক্লাস টিচার সুশীলস্যার বালক শান্তিবাবুকে ডেকে পাঠালেন। শান্তিবাবু তো ঘাবড়ে গেলেন। তাঁর ডাক পড়ল কেন, তিনি তো গোলমালে নেই। ক্লাসের টিমেও কখনও থাকেন না। সাইড লাইনের বাইরে বসে চুপ করে খেলা দেখেন শুধু।

সুশীলস্যার বললেন, “তুই কোনও গোলমালে থাকিস না বলেই তোকে ডেকে পাঠিয়েছি। তোকে এই অশান্তি থামাতে হবে।”

শান্তিবাবু আঁতকে উঠে বলেছিলেন, “আমি অশান্তি থামাব! স্যার, আমার কথা কে শুনবে? কেন শুনবে?”

সুশীলস্যার বললেন, “তা বললে কী করে হবে, তোমার নাম শান্তি আর এইটুকু অশান্তি তুমি থামাতে পারবে না!”

ক্লাস এইটের শান্তি সান্যালের বুকটা ধক করে উঠল। নামের জোরে সে এত বড় একটা ঝগড়া সামলে দিতে পারবে, তা কখনও হয়!

সুশীলস্যার পিঠে হাত দিয়ে হেসে বললেন, “নামের কথাটা আমি মজা করে বললাম। নাম কোনও ব্যাপার নয়, স্বভাবটাই ব্যাপার। শান্তশিষ্ট বলে সহপাঠীরা তোকে পছন্দ করে। এই পছন্দটাকে কাজে লাগা। একটা উপায় বের কর। ঠান্ডা মাথায় বন্ধুদের বোঝা। সবাই বলবে, ভাগ্যিস ক্লাসে শান্তি ছিল, তাই তো এত বড় অশান্তি মিটল। পারবি না?”

বালক শান্তিবাবুর বুকের ধুকপুকানি বেড়ে গেল। লোভও হতে লাগল। সত্যি যদি কাজটা পারেন, তা হলে সত্যি তাঁর যেমন প্রশংসা হবে, তাঁর নামের মর্যাদাও রক্ষা হবে। সে দিন রাতে অনেক ক্ষণ জেগে ছটফট করেছিলেন শান্তিবাবু। তিনি কি সহপাঠীদের এই অশান্তি থেকে বের করতে পারবেন?

শান্তিবাবু পারলেন। দুটো দলকে বুঝিয়ে শান্ত করলেন। টিমে যেমন আক্রমণাত্মক খেলোয়াড়রা সুযোগ পেল, রক্ষণভাগেও কয়েক জনকেও নেওয়া হল। এই পরিকল্পনা কাজ দিল দারুণ ভাবে। সে বার টুর্নামেন্টে ক্লাস এইট ট্রফি জিতে আনল। ক্লাসের সবাই শুধু ট্রফি হাতে লাফাল না, সাইড লাইনের ধারে বসে থাকা শান্তিবাবুকেও কাঁধে তুলেও লাফাল। স্কুলে রটে গেল, ক্লাস এইটের শান্তশিষ্ট শান্তি সান্যাল ভেলকি জানে। সেই ভেলকি হল তার বুদ্ধি আর ঠান্ডা মাথা। তা-ই দিয়ে সে অশান্তি দূর করতে পারে। ব্যস, সেই বালক বয়সেই শান্তিবাবুর ‘সর্বনাশ’ হল। স্কুল ছড়িয়ে পাড়া-প্রতিবেশীর মধ্যেও খবর রটে গেল। কেউ কেউ মজা করে বলতে লাগল, “অশান্তি সামলাতে পারবে বলেই ওই ছেলের নাম শান্তি।”

এর পর সেই ছোট বয়সেই স্কুলের কত রকম গোলমাল যে শান্তিবাবুকে সামলাতে হয়েছে, তার ঠিক নেই। নিজের ক্লাসের ঝগড়া-মারপিট তো থামাতে হতই, অন্য ক্লাস থেকেও ডাক পড়ত। শুধু ঝগড়া নয়, কারও খাতা-পেন হারালে, কেউ বই কিনতে না পারলে এগিয়ে আসতেন শান্তিবাবু। কখনও টিফিনের পয়সা বাঁচিয়ে খাতা কিনে দিতেন, কখনও নিজের বাড়তি পেন, পেনসিল বিলোতেন। ক্লাস টেনে ওঠার পর তো বড় অশান্তি হল। শান্তিবাবুর সহপাঠী বিক্রম ক্লাস পরীক্ষায় ফেল করে বাড়ি থেকে পালাল। বিক্রমের বাড়িতে

হইহই কাণ্ড। কান্নাকাটি, থানা–পুলিশ। শান্তিবাবু ওর বই-খাতা ঘেঁটে জানতে পারলেন, বসিরহাটে এক জনের সঙ্গে ক'দিন হল বিক্রমের আলাপ হয়েছে। খাতায় তার ঠিকানাও মিলল। বিক্রমের বাবাকে নিয়ে বসিরহাটে দৌড়লেন কিশোর শান্তিবাবু। সেখানে বিক্রমকে পেয়ে বাড়ি ফিরিয়ে আনলেন তো বটেই, তার পর থেকে সপ্তাহে তিন দিন তার সঙ্গে পড়াশোনা শুরু করলেন। শান্তিবাবু ছাত্র খারাপ ছিলেন না। বিক্রমও বন্ধুর সঙ্গে বসে মন দিয়ে পড়তে লাগল। উৎসাহই পেল সে। খুব ভাল ফল না করলেও পরীক্ষায় পাশও করে গেল। তার বাড়িতে শান্তি তো ফিরলই, শান্তি সান্যালের নাম ছড়িয়ে পড়ল আরও।

লেখাপড়ার পাঠ শেষ করে, বড় হয়েও রেহাই পেলেন না শান্তিবাবু। পাড়ায় দুই প্রতিবেশীর গাছ কাটা নিয়ে ঝগড়া হলে যেমন ডাক পড়ে, তেমন কোনও বাড়িতে সকালের চায়ের কাপে দুধের সর নিয়ে কর্তা-গিন্নির তুমুল ঝগড়া শুরু হলেও ডাক পড়ে। পাড়ার লোক বাড়ি এসে হাজির হয়।

শান্তিবাবু বিরক্ত হয়ে বলেন, "আরে বাবা, পরিবারের অশান্তিতে আমি কী ভাবে নাক গলাব, গলাবই বা কেন?"

"শান্তিবাবু, এই অশান্তি শুধু ওই পরিবারের মধ্যে নেই, চিৎকারে পাড়ার লোকেরও কান পাতা দায়। কাক-চিল আকাশে উড়ছে না, আমাদেরও ওই পথ মাড়ানো বন্ধ। অনেকটা ঘুরপথে বাজারে যেতে হচ্ছে। ফলে স্কুল, কলেজ, অফিসে লেট। দয়া করে আপনি এই অশান্তি থামানোর একটা ব্যবস্থা করুন শান্তিবাবু।"

শুধু কি ঝগড়ার অশান্তি? মোটেও নয়! ঝড়ে ইলেকট্রিকের তার ছিঁড়লে বিদ্যুৎ অফিসে শান্তিবাবুকে সবাই নিয়ে যায়। গুছিয়ে কথা বলতে পারবেন। রাস্তা মেরামতের জন্য সরকারি দফতরে কে যাবে, সেই শান্তিবাবুকে চাই। ক্লাবের ফাংশনের অনুমতি চাইতে থানার বড়বাবুর সঙ্গে কথা বলবে কে, শান্তিবাবুকে ডাক।

মানুষ ছাড়াও কি অশান্তি হয় না? অবশ্যই হয় এবং সেখানেও যেতে হয় শান্তিবাবুকে। এই তো গত সপ্তাহেই হল।

মামাতো বোনের সাধের বিড়াল ভুটাই তিন দিন ধরে খাওয়া বন্ধ করে দিয়েছে। মাছ দেখলে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে, দুধ দেখলে এমন ভাবে তাকাচ্ছে যে মনে হচ্ছে, বাটি করে তাকে খানিকটা নিম পাতার রস দেওয়া হয়েছে। মামাতো বোনের ঘুম ছুটছে। কাজকর্ম বন্ধ। হওয়ারই কথা। প্রিয় বিড়াল অনশন শুরু করলে এই অশান্তি তো হবেই। অশান্তি সামলাবে কে, ডাক পড়ল দাদার। বোনের কথা তো ফেলা যায় না, অফিস কামাই করে শান্তিবাবু ছুটলেন কোন্নগর। না ছুটে

ভুটাইয়ের মুখের সামনে না দিয়ে মাছের গামলা, দুধের বাটি সরিয়ে রাখলেন। খানিকটা লুকিয়েই রাখলেন। তার পর বোনকে নিয়ে সরে পড়লেন। ঘণ্টা খানেক পর দেখা গেল ভুটাই আরাম করে ঘুমোচ্ছে। 'ফুড়ুৎ ফুড়ুৎ' করে নাকও ডাকছে। তার সামনে মাছের কাঁটা, গোঁফের চার পাশে দুধের রেখা। মামাতো বোন লাফ দিয়ে, হাততালি দিয়ে বলল, "ভুটাই অনশন ভেঙেছে! কেমন করে হল দাদা?"

উপায় কী, এর পর ওই মেয়েও হয়তো খাওয়াদাওয়া ছেড়ে বিড়ালের অনশনে যোগ দেবে। কোন্নগর যেতে যেতে নিজের উপর দাঁত কিড়মিড় করতে লাগলেন শান্তিবাবু। যুক্তি দিয়ে যে যা-ই বোঝাতে যাক, তাঁর স্থির বিশ্বাস, নামের জন্যই তিনি এই বিপদে পড়েছেন। নাম যদি 'কলহপ্রিয়' বা 'লড়াকুনাথ' হত, তা হলে কি কেউ তাঁকে এ ভাবে ঝামেলা সামলাতে ডাকত, মোটেও নয়। 'শান্তি' নামটাই যত নষ্টের গোড়া।

মামাতো বোনের বিড়াল-বিষয়ক অশান্তির সমাধান করতে বিশেষ বেগ পেতে হল না শান্তিবাবুকে। ভুটাইয়ের মুখের সামনে না দিয়ে মাছের গামলা, দুধের বাটি সরিয়ে রাখলেন। খানিকটা লুকিয়েই রাখলেন। তার পর বোনকে নিয়ে সরে পড়লেন। ঘণ্টা খানেক পর দেখা গেল ভুটাই আরাম করে ঘুমোচ্ছে। 'ফুড়ুৎ ফুড়ুৎ' করে নাকও ডাকছে। তার সামনে মাছের কাঁটা, গোঁফের চার পাশে দুধের রেখা।

মামাতো বোন লাফ দিয়ে, হাততালি দিয়ে বলল, "ভুটাই অনশন ভেঙেছে! কেমন করে হল দাদা?"

শান্তিবাবু পায়ে চটি গলাতে গলাতে বললেন, "রোজ খাবার মুখের সামনে ধরলে বিড়ালের অরুচি হয়। মাঝেমধ্যে চুরি করে না খেলে ওরা স্বাদ পায় না। এমনি দুধের স্বাদ আর চুরির দুধের স্বাদ বিড়ালের জন্য আলাদা। সেই ব্যবস্থাই করেছিলাম। তোর অশান্তি কেটেছে আশা করি, এ বার যাই।"

অফিসেও একই অবস্থা শান্তি সান্যালের। সেখানে যে কত রকমের অশান্তি তার ঘাড়ে এসে পড়ে, তার শেষ নেই। দুম করে বেশি কাজ এসে যাওয়ার অশান্তি, জ্বরজারিতে সহকর্মী কামাই করলে সামলে দেওয়ার অশান্তি, অফিস পিকনিকের বাগানবাড়ি খোঁজার অশান্তি, পিকনিকের মেনুতে ফিশ পকোড়া হবে না চিকেন পকোড়া হবে তা-ই নিয়ে অশান্তি। আরও ঝামেলা আসে। সহকর্মীদের কারও মেয়ের বিয়ে হলে অফিস থেকে টাকা ধার করে জোগাড় করার দায়িত্ব শান্তিবাবুকেই নিতে হয়। তিনি নাকি কর্তাদের ভাল করে বোঝাতে পারবেন। টাকার অভাবে পিয়ন হরিনাথের ছেলের ইঞ্জিনিয়ারিং পড়া আটকে যাওয়ার অশান্তিও শান্তিবাবুকে সামলাতে হয়েছে। ঘুরে ঘুরে টাকা জোগাড় করেছেন।

এত সামলে শান্তি সান্যাল শুধু বিরক্ত নন, ক্লান্তও বটে। তিনি বুঝেছেন, সব দিক থেকেই দোষ তাঁর। কারও অশান্তি দেখলে এত ঝাঁপিয়ে পড়ার দরকার কী? নিজেকেই থামাতে হবে।

আজ যা ঘটেছে তা শান্তিবাবুর কাছে খুবই লজ্জার। এ ধরনের ঝামেলায় যাতে ভবিষ্যতে আর পড়তে না হয়, সে কারণে তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, বদলি নেবেন। নিজের শহর, পাড়ার পরিচিতদের ছেড়ে দূরে কোনও নির্জন জায়গার শাখা অফিসে যোগ দেবেন। অফিসকে অনুরোধ করলে নিশ্চয়ই বদলি পাওয়া যাবে। নির্জন জায়গায় অফিসের কেউ যেতে চায় না। শান্তিবাবুর কোনও অসুবিধে নেই।

বিয়ে-থা করেননি, একা থাকতে কোনও সমস্যা হবে না। তিনি একাই থাকতে চান। আর তিনি চান না, নতুন যে জায়গায় যাবেন, সেখানে কেউ তাঁকে চিনুক, কোনও অশান্তি ঘাড়ে এসে পড়ুক।

আজ অফিসে টিফিনের পর নীলাঞ্জন এসে দুটো হাত জড়িয়ে ধরল। নীলাঞ্জন কাজ করে শান্তিবাবুরই দফতরে।

শান্তিবাবু বললেন, ''কী হয়েছে নীলাঞ্জন?''

নীলাঞ্জন বলল, ''আমাকে বাঁচান শান্তিদা। চাকরিটা মনে হয় চলে যাবে। সংসার নিয়ে পথে বসব।''

''কী হয়েছে সেটা তো বলবে।''

ঘটনা বলল নীলাঞ্জন। হিসেবে একটা মারাত্মক ভুল করে ফেলেছে সে। যোগের বদলে বিয়োগ করেছে। সেই ভুল ধরা পড়েছে। ভাগ্যিস ধরা পড়েছে, নইলে অফিসের বড় ক্ষতি হয়ে যেত। নীলাঞ্জনের ভয়, অফিসের কর্তারা যদি জানতে পারেন এই ভুল তার, তা হলে তাকে বড় শাস্তি পেতে হবে।

শান্তিবাবু অবাক হয়ে বললেন, ''এমন একটা বিশ্রী ভুল করলে কী করে?''

নীলাঞ্জন কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, ''সাত দিন হল মেয়েটার ধুম জ্বর, খুব অশান্তিতে আছি। কাজে মন বসাতে পারছি না।''

জেনে-বুঝে আবার সেই এক কাণ্ড করে বসলেন শান্তিবাবু। অশান্তি ঘাড়ে নিলেন। একটু চুপ করে থেকে বললেন, ''আচ্ছা, আমি দেখছি। তুমি কাজে যাও।''

খানিক ক্ষণ থম মেরে বসে থাকলেন শান্তি সান্যাল। তার পর উঠে ম্যানেজার সমরেশ সেনের ঘরের দিকে পা বাড়ালেন।

অফিসের আর পাঁচ জনের মতো সমরেশ সেনও শান্তিবাবুকে বিশেষ পছন্দ করেন। বললেন, ''বলুন শান্তিবাবু।''

শান্তিবাবু বললেন, ''হিসেবের ভুলটা আমি করেছি।''

সমরেশ সেন চোখ কপালে তুলে বললেন, ''আপনি! আপনি এমন একটা ভুল করেছেন শান্তিবাবু!''

শান্তিবাবু নিচু গলায় বললেন, ''নীলাঞ্জনের হিসেবটা আমি কম্পিউটারে খুলে দেখছিলাম। তখনই ভুলটা করে ফেলি। পানিশমেন্ট কিছু দিতে হলে আমাকেই দিন স্যর। নীলাঞ্জন খুবই অশান্তির মধ্যে পড়েছে...''

'অশান্তি' শুনে এত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাতেও হেসে ফেললেন সমরেশ সেন। বললেন, ''শান্তিবাবু, আমি এত বোকা নই। ভুল যে আপনি করেননি, আমি বুঝতে পারছি। আপনি মিথ্যে কথা বলতে পারেন না। কিন্তু নিজের ঘাড়ে দোষ টেনে নিয়ে আপনার অশান্তি সামলানোর এই চেষ্টাকেও ছোট করতে পারছি না। ঠিক আছে, নীলাঞ্জনের বিরুদ্ধে এ বার কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হবে না। তবে ওকে বুঝিয়ে বলবেন, আর যেন এ রকম না হয়। আপনি বসুন, এক কাপ চা খান। আপনার কাছ থেকে অশান্তি দূর করার গল্প শুনি।''

সে দিনই রাতের খাওয়া সেরে বদলির আবেদন লিখতে বসলেন শান্তি স্যানাল।

॥ ২ ॥

অফিস আবেদন মেনেছে। নতুন জায়গায় বদলি করা হয়েছে শান্তি সান্যালকে। তবে পুরো আবেদন মানা হয়নি। আপাতত তিন মাস। নতুন জায়গায় নিজেকে মানাতে পারলে পাকাপাকি বদলি করা হবে। এমন সুযোগ অন্য কাউকে দেওয়া হয় না। শান্তিবাবু পেয়েছেন। তিনি এক জন ভাল কর্মী বলে দেওয়া হয়েছে।

পাহাড়ের উপর ছোট্ট শহর। লোকজন কম। শান্তিবাবুর শাখা অফিসেও হাতে গোনা ক'জন কর্মী। আজ পনেরো দিন হল এখানে এসেছেন, শান্তিবাবুকে এখনও শহরের কেউ তেমন চেনে না। নিজের নাম যতটা সম্ভব গোপন করেছেন। কেউ জানতে চাইলে এড়িয়ে যান। বলেন, ''আমি ওই অফিসের নতুন ম্যানেজার। আমাকে ম্যানেজার বলে ডাকলে খুশি হব।''

ঠান্ডাটা আজ বেশি পড়েছে যেন। তাড়াতাড়ি রাতের খাওয়া সেরে লেপ মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়েছেন শান্তিবাবু। মনটা হালকা। একটা বড় বোঝা ঘাড় থেকে নামাতে পেরেছেন। অশান্তি সামলানোর বোঝা। এখানে অশান্তিও নেই, কেউ বলতেও আসবে না। চোখে ঘুম আসতেই দরজায় ধাক্কার আওয়াজ। ধড়মড়িয়ে উঠলেন শান্তিবাবু। এত রাতে কে এসেছে?

কে নয়, এসেছে বেশ কয়েক জন। দরজা খুলতেই কোট, মাঙ্কি ক্যাপ, দস্তানা পরা তারা হুড়মুড়িয়ে ঘরে ঢুকে পড়ল।

''ম্যানেজার সাহেব, আপনার অফিসের গাড়িটা দিতে হবে। সুজয়বাবু অসুস্থ, মনে হচ্ছে হার্ট অ্যাটাক। এখনই হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে।''

শান্তিবাবু বললেন, ''কে সুজয়বাবু?''

''এখানে থাকেন। খুব ভাল মানুষ, খুব উপকারী। আমাদের কত বিপদ যে সামলে দেন তার ঠিক নেই! ওর জন্য আমরা কত ঝামেলা, কত অশান্তি থেকে যে বেরিয়ে আসি তার ঠিক নেই। এখন তিনি ঝামেলায় পড়েছেন। একা মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। আপনি যদি গাড়ির ব্যবস্থা করে দেন ভাল, না করলে, আমরা ঘাড়ে করেই হাসপাতালে নিয়ে যাব। ওকে সুস্থ করতেই হবে।''

শান্তিবাবু কয়েক মুহূর্ত চুপ করে রইলেন। মাথার ভিতরটা যেন পরিষ্কার হয়ে উঠছে। সুজয়বাবু নামের অচেনা এক জন তার ভুল ধারণা ভেঙে দিলেন। 'শান্তি' নাম হলে তবেই মানুষের সমস্যায় কেউ ঝাঁপিয়ে পড়বে এ কথা একেবারেই ঠিক নয়। সুজয়বাবুর নাম তো 'শান্তিবাবু' নয়। নাম নয়, মন অন্যের অশান্তি দূর করতে চায় কিনা এটাই আসল কথা। যে কোনও নামেই সমস্যা, ঝামেলায় মানুষের পাশে থাকা যায়। আর তাঁকে সবাই এতটাই ভালবাসে যে, দরকার হলে কাঁধে করে হাসপাতালেও নিয়ে যায়। এই ভালবাসা পাওয়া সহজ কথা নয়।

শান্তিবাবুর ঘোর কাটল। নিচু গলায় বললেন, ''দাঁড়ান আমি টেলিফোন করে ড্রাইভারকে ডাকছি। সুজয়বাবুকে নিয়ে আমিও আপনাদের সঙ্গে হাসপাতালে যাব।''

সুজয়বাবু ভাল হয়ে উঠছেন। শান্তিবাবু রোজই খবর নেন। তবে তাঁর মনে একটা নতুন অশান্তি তৈরি হয়েছে। এই 'অশান্তি' হল 'মন কেমন'-এর অশান্তি। তাঁর মন বলছে, পুরনো অফিস, শহর, পাড়া, পরিচিতদের ছেড়ে চলে আসাটা ঠিক হয়নি। ওদের তো তাঁকে দরকার হতে পারে। কখন কী অশান্তি হবে, কেউ কি বলতে পারে?

শান্তিবাবু পর দিনই অফিসে ফের আবেদন পাঠালেন। এই জায়গায় তাঁর মন বসছে না। মনে অশান্তি হচ্ছে। তিনি পুরনো জায়গায়, পুরনো অফিসে ফিরে যেতে চান।

ছবি: কুনাল বর্মণ

কী ভালই না লাগে এই সময়ের সোনালি রোদ্দুরটা। এই রোদের অদ্ভুত সুন্দর রংটার সঙ্গে তোমার চেনা কোন জিনিসের মিল পাও? লেখা প্রতিযোগিতার ফলাফল।

প্রথম

সকালবেলা শরৎকালের সোনালি রোদটা দেখে আনন্দে ভরে গেল মন আর মনে পড়ে গেল আগের ছুটিতে মামার বাড়ি ঘুরতে যাওয়ার আনন্দ! একটু খুলে বলি। স্কুলে দু'দিনের ছুটি পড়তেই আমরা মামার বাড়ি গেছিলাম। যেতেই দিদা দইবড়া খেতে দিল। সেটা খেয়ে আমি জামাকাপড় বদলে এলাম। তার পর আমি আর বোন মিলে খেললাম সারা সকাল। দুপুরে খেলাম ভাত, ডাল, মাছের ডিমের বড়া, মাছ, চাটনি, দই। কী ভাল রান্না করে দিদা! দিদা সকলের জন্য আইসক্রিম বানিয়েছিল। বিকেলে সেটা খেলাম। তার পর দাদাইয়ের সঙ্গে গল্প করলাম আর টিভি দেখলাম। রাত্তিরে খেলাম রুটি আর মাংস। কী মজা! পরের দিনটাও কাটল শুধু খেলে, গল্প করে আর ভাল ভাল খাবার খেয়ে। আমি ভোরবেলা বাবার সঙ্গে গঙ্গার ধারে গেলাম। ভোরের মিষ্টি আলোয় কী ভাল লাগছিল গঙ্গার জল। পরের দিন আমরা বাড়ি ফিরলাম। দিদা আর দাদাইয়ের জন্য খুব মন কেমন করছিল। কিন্তু ঠিক এই শরৎকালের রোদের মতোই মনটা ভরে ছিল এক অদ্ভুত আনন্দে।

দইবড়া

শুভ্রজা চট্টোপাধ্যায়
চতুর্থ শ্রেণি, অ্যাডামাস ইন্টারন্যাশনাল স্কুল, বেলঘরিয়া।

বর্ষা কাটিয়ে যখন শরতের আগমন হয়, তখন রোদের রং পাল্টাতে থাকে। পাল্টাতে পাল্টাতে এই রোদ সোনালি রং ধারণ করে। মা দুর্গার আগমনের সময় হয়ে যায়। আকাশ, বাতাস, শিউলি ও কাশ ফুল মা দুর্গাকে পৃথিবীতে স্বাগত জানায়। সোনালি রোদের দিকে তাকালেই বুঝতে পারি মামার বাড়ি যাওয়ার সময় এগিয়ে আসছে। মামার বাড়ি যাওয়ার পথে বড় বড় শাল গাছের জঙ্গল পড়ে। সেই শালবনের মাথায় যখন সোনালি রোদ পড়ে, তখন বনটা যেন পবিত্র হয়ে ওঠে। মামার বাড়িতে কত আনন্দে পুজো কেটে যায়। পুজোর কয়েকটা দিন যেন সোনা রং আরও গাঢ় হয়ে ওঠে। মা অষ্টমীর দিন অঞ্জলি দিতে যায়। লালপাড় শাড়ি, কপালে টিপ, পায়ে আলতা, সিঁথিতে সিঁদুর। সোনালি রোদের ভিতর দিয়ে মা যখন হেঁটে যায়, মাকে অচেনা ও সুন্দর লাগে। এ রকমই এক পুজোর সময় মামার বাড়ি যাচ্ছিলাম। শহরে ঢোকার আগে দেখলাম, রাস্তার ধারে আমার বয়সি এক পথশিশু তার মায়ের সঙ্গে বসে আছে। গায়ে ছেঁড়া জামা। আমার একটা নতুন জামা ছিল। ওকে দিতেই ওর মুখটা হাসিতে ঝলমল করে উঠল। ঠিক শরতের সোনালি রোদের মতোই।

দেবীপ্রতিমা

শ্রুতায়ু পণ্ডা
পঞ্চম শ্রেণি, কৃষ্ণগঞ্জ কৃষি শিল্প বিদ্যালয়, হোগলা, পূর্ব মেদিনীপুর।

তৃতীয়

ভাদ্র মাস, প্রকৃতির সুঠাম চেহারায় লেগেছে শরতের ছোঁয়া। স্নিগ্ধ সোনালি রোদ বিরাট মেঘগুলো ছিন্ন করে পুরো গগনে পর্যাপ্ত রশ্মি বিতরণের পর ভূতল অব্দি ছড়িয়ে পড়েছে অকৃপণ ভাবে। ভোরের ও বিকেলের সোনালি সূর্যালোক দেখে প্রথমেই মনে হয় সূর্যমুখী ফুল ও সরষে খেতের কথা, কিন্তু ব্যাপারটির বিস্তৃতি কি এ পর্যন্তই? হয়তো না, চিন্তাধারার সঙ্কীর্ণতা ও প্রসারতা এ ক্ষেত্রে একটি মুখ্য ভূমিকা রাখে। আমি শিশুদের হাসিতে সোনার রোদের ঝলক দেখতে পাই। তাদের নিষ্পাপ, নির্লোভ, স্বচ্ছ চাহনি থেকে যেন ঠিকরে বেরোয় সোনালি আভা। শিশুদের প্যাঁচবিহীন মনে যেন পরমেশ্বর থাকেন সগৌরবে। অপর দিকে প্রায় সব বয়স্ক মানুষই হন সম-মনোভাবাপন্ন। প্রবীণ কালে তাঁরাও মনের সব মলিনতা মুছে ঈশ্বর-চিন্তায় মগ্ন হন। তাঁদের মুখের এক খণ্ড হাসিতেও পাই সোনা রোদের রং। আরও যে জায়গা থেকে আমি এ-হেন অনুভূতি পাই তা হল, যখন দেখি মিথ্যার প্রগাঢ় আঁধার ছিন্ন-ভিন্ন করে সত্যের আলো দেখা দেয়। সে আলো হয় সোনালি, উজ্জ্বল, আর অপ্রতিরোধ্য। অতএব, যেখানে সত্য, ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি ও পরার্থপরতা বিরাজমান, সেখানেই এই সোনালি আলো দেখা যায়।

সূর্যমুখী ফুল

মুগ্ধ আদিত্য
অষ্টম শ্রেণি, অমরপতি লায়ন্স সিটিজেন্স পাবলিক স্কুল, শিলিগুড়ি।

চতুর্থ

দু'দিন ছুটি কাটাতে মামার বাড়ি গেছিলাম। বাড়ির পাশে একটা নদী আছে। দুপুরবেলা খাওয়া সেরে ,একটু নদীর ধারে বসলাম। নদীটাকে যেন আজ নতুন রূপে দেখলাম। বিকেলের সোনালি রোদ্দুরটা নদীতে এসে পড়ায় মনে হচ্ছিল যেন এক জন নতুন বৌকে গা-ভরা গয়না দিয়ে সাজানো হয়েছে। হঠাৎ তাকিয়ে থাকতে থাকতে মনে হল, নদীর নীচে যেন কোনও এক রহস্যময় শহর! যে শহরে কোনও মানুষ নেই, কোনও গাছপালা নেই। কিন্তু তাও সে অপূর্ব সুন্দর! সে শহর তৈরি সোনা দিয়ে, এটা ভাবতে ভাবতেই মনে হল আমি যেন সেই সোনার শহরের রহস্য ভেদ করতে পেরেছি। সে যেন আমায় হাতছানি দিয়ে ডাকছে, আমি যেন সেই খুঁজে না পাওয়া সোনার শহর এল ডোরাডোকে দেখতে পেয়েছি। ইচ্ছে হল, নদীর নীচে গিয়ে সেই শহরের রহস্য ভেদ করি। কিন্তু সেই সোনালি শহরকে হারানোর ভয়ে তীরে বসেই সৌন্দর্য উপভোগ করলাম। তার পর ধীরে ধীরে সন্ধের অন্ধকারে সেই শহর আবার রহস্যের অন্তরালে চলে গেল। রোদ্দুরের এই অদ্ভুত সুন্দর রং আজ আমায় সোনার শহরের রহস্যে একাত্ম করে দিল।

ধূর্জতি রায়
অষ্টম শ্রেণি, বীণা মোহিত মেমোরিয়াল স্কুল, মহিষবাথান, কোচবিহার।

শরতের আকাশ

এই সময়ের রোদ্দুরটা কী ভাল লাগে। দুপুরটায় আরও ভাল লাগে। এই দুপুরের সোনা রোদ্দুরের সঙ্গে আমি মিল পাই আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ও শিক্ষিকাদের। তাঁদের আলো আমাদের জীবনের পথ দেখায়, ঠিক এই রোদ্দুরের মতো। রোদ্দুর যেমন সব কিছু আলোকিত করে তেমনই আমাদের শিক্ষকরা আমাদের জ্ঞানের আলোয় পরিপূর্ণ করেন। তাঁদের জ্ঞানের আলোই আমাদের ভবিষ্যৎ আলো করে। রোদ্দুরটা কখনও কড়া আর কখনও মিঠে। ঠিক আমাদের শিক্ষকদের মতো। রোদ্দুর থাকলে কখনও আঁধার হয় না। শিক্ষকরাও আমাদের জীবন আঁধার হতে দেন না। শরতের আকাশ যেমন ঝকঝকে হয়, এই রোদ্দুর মনটাকেও ঝকঝকে করে তোলে। এই ভাবেই আমি এই সময়ের সোনা রোদ্দুরে শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ও শিক্ষিকাদের ভালবাসার ছোঁয়া পাই।

অন্বিজা চিকি
তৃতীয় শ্রেণি, সেন্ট জন্স ডায়োসেশন গার্লস হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল, কলকাতা।

শান্ত নদী-তীর

আরও যারা ভাল লিখেছে

তথাগত দত্ত গুপ্ত
অষ্টম শ্রেণি, সাউথ পয়েন্ট হাই স্কুল, কলকাতা।

অদ্রিজা ভট্টাচার্য্য
অষ্টম শ্রেণি, পাঠভবন ডানকুনি, হুগলি।

অরিজিৎ দে
পঞ্চম শ্রেণি, চাতরা নন্দলাল ইনস্টিটিউশন, শ্রীরামপুর, হুগলি।

ধৃতিঋদ্ধা সরকার
অষ্টম শ্রেণি, পাঠভবন ডানকুনি, হুগলি।

সূর্যাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়
অষ্টম শ্রেণি, বর্ধমান পৌর উচ্চ বিদ্যালয়।

সপ্তক ঘোষ
ষষ্ঠ শ্রেণি, বোলপুর হাই স্কুল, বোলপুর, বীরভূম।

ঔষ্ণীক দাশ
দ্বিতীয় শ্রেণি, টেকনো ইন্ডিয়া গ্রুপ অফ পাবলিক স্কুল, মেদিনীপুর।

সমগ্গা ঘোষ
দ্বিতীয় শ্রেণি, মাউন্ট লিটেরা জি স্কুল, পশ্চিম মেদিনীপুর।

তিতলি মুখোপাধ্যায়
অষ্টম শ্রেণি, রামকৃষ্ণ সারদা মিশন সিস্টার নিবেদিতা গার্লস স্কুল, কলকাতা।

এ বারের প্রতিযোগিতা

পুজোর পর এই সময়টা সন্ধের পর ঝুপ করে নামে অন্ধকার। এক দিন স্কুল থেকে ফেরার সময় শেষ বিকেলে মাঠের পোড়ো বাড়িটার জানলায় দেখলে... যারা ক্লাস টু থেকে এইটে পড়ো, আনন্দমেলার দফতরে লেখা পাঠাবে ২৫ অক্টোবরের মধ্যে। বাড়ির ঠিকানা, পিনকোড, ফোন নম্বর, স্কুলের নাম, ক্লাস, ঠিকানা, ফোন নম্বর জানিয়ো বাংলা আর ইংরেজিতে। লেখার শব্দসংখ্যা ১৫০। মনে রেখো। সেরা কয়েকটি লেখা আমরা ৫ নভেম্বর সংখ্যায় ছাপব। anandamelamagazine@gmail.com এই ইমেল আইডি-তেই লেখা পাঠাবে, মেলবডিতে পেস্ট করে। ফটো তুলে পাঠাবে না।

চন্দ্রগ্রহণের পরে

ইন্দ্রনীল সান্যাল

বর্ধমান রোডের বহুতল আকাশলীনা-র এগারো ও বারো তলা জুড়ে যে ডুপ্লেক্স, তার মালকিন হলেন শিউলি সেন। তিনি গোয়েন্দা সুনীল সেনের বোন। রাত আটটা নাগাদ ড্রয়িং রুমে বসে সুনীল আর শিউলি আড্ডা মারছেন, এমন সময় কলকাতা পুলিশের ডেপুটি কমিশনার চিনার মিত্রর ফোন এল।

"আকাশলীনায় পনেরো মিনিট আগে একটা আনন্যাচরাল ডেথ হয়েছে।"

"এই বিল্ডিংয়ে?" সুনীল অবাক।

"এখন পূর্ণগ্রাস চন্দ্রগ্রহণ চলছে। আকাশলীনার ছাদে টেলিস্কোপ ফিট করে বিজ্ঞানী প্রসিত সেন চার জন ছেলেমেয়েকে চন্দ্রগ্রহণ দেখাচ্ছিলেন। ওরা সবাই আকাশলীনার বাসিন্দা, সেন্ট হেলেনা স্কুলের সহপাঠী, ক্লাস টুয়েলভের বোর্ড এগজ়াম দিয়ে রেজ়াল্টের জন্যে অপেক্ষা করছে। চন্দ্রাণী মুখোপাধ্যায় নামের একটি মেয়ে ছাদ থেকে পড়ে মারা গেছে।"

"এটা অ্যাক্সিডেন্ট হলে আপনি আমাকে ফোন করতেন না।"

"চন্দ্রাণীর দিদির সন্দেহ, এটা মার্ডার। ভিক্টিম পড়ে যাওয়ার আগে 'বাঁচাও' বলে চিৎকার করেছিল। চারটে ছেলেমেয়ের বাবা-ই আইএএস অফিসার। রেজ়াল্ট বেরোলেই ওরা হায়ার স্টাডিজ়ের জন্যে বিদেশ যাবে। পুলিশ রেকর্ড থাকলে ভিসা পাবে না। তাই মিনিমাম পুলিশি তদন্তের পরে ফাইল ক্লোজ় করার জন্যে আমার ওপরে চাপ আছে।"

পরিস্থিতি বুঝতে পেরে সুনীল বললেন, "আমি এক্ষুনি যাচ্ছি। স্পটে লোকাল থানার কেউ আছে?"

"এক জন কনস্টেবল আছে গ্রাউন্ড ফ্লোরে, ভিক্টিমের বডির পাশে। ছাদে সিসিটিভি ক্যামেরা নেই," বললেন চিনার, "আমি ফরেন্সিক টিম নিয়ে একটু পরেই পৌঁছোচ্ছি।"

"মাথায় একটা আইডিয়া এসেছে..." ফ্ল্যাট থেকে বেরোলেন সুনীল।

॥ ২ ॥

আকাশলীনার ছাদ এত বড় যে, গড়ের মাঠ বলে ভ্রম হয়। একে রাত, তার উপরে পূর্ণগ্রহণ চলছে। ছাদে আঁধার বেশি, আলো কম। তারই মধ্যে সুনীল দেখতে পেলেন, কোমর-সমান পাঁচিলের ধারে চার জন দাঁড়িয়ে গুজুর গুজুর করছে। সেখানে গিয়ে সুনীল জিজ্ঞেস করলেন, "ছাদে লাইট নেই?"

"বেশির ভাগ আলোই জ্বলে না," বললেন এক ভদ্রলোক, "বাকিগুলো আমি নিভিয়ে দিয়েছিলাম। অন্ধকারে গ্রহণ ভাল দেখা যায়। জ্বালাচ্ছি, দাঁড়ান।"

সুইচ অন করার পরে দেখা গেল যিনি কথা বলছেন, তাঁর বয়স বছর চল্লিশ। পরনে জিন্স আর টি-শার্ট। পায়ে কাবলি জুতো, হাতে মোবাইল। নিজের পরিচয় দিয়ে করমর্দনের জন্যে হাত বাড়িয়ে সুনীল বললেন, "কলকাতা পুলিশের ডেপুটি কমিশনারের নির্দেশে এসেছি।"

"আমি প্রসিত সেন। ডিআরডিও-র সায়েন্টিস্ট," হ্যান্ডশেক করলেন প্রসিত।

ডিফেন্স রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজ়েশনের হেড অফিস দিল্লিতে। এই প্রতিষ্ঠানের কাজ দেশের প্রতিরক্ষা প্রযুক্তিকে উন্নত করা।

সুনীল বললেন, "বিজ্ঞানীর সঙ্গে আলাপ হয়ে খুব ভাল লাগল। আপনার পোস্টিং কোথায়?"

"আমি বৌ-বাচ্চা নিয়ে দিল্লিতে থাকি। বাবা-মা আকাশলীনায় থাকেন। আমি মাসে এক বার আসি। এই বারের আসাটা লুনার একলিপ্সের সঙ্গে ম্যাচ করে গেল বলে ভাবলাম, এই নিয়ে একটা সচেতনতামূলক ইভেন্ট করি। সেই জন্যে দুটো টেলিস্কোপ আনালাম। কিন্তু কী যে হয়ে গেল..."

প্রসিতের কব্জি ধরে এক পাশে সরিয়ে সুনীল প্রশ্ন করলেন, "এই তিন জনের নাম বলুন।"

"একদম বাঁ দিকের মেয়েটি চন্দ্রাণীর যমজ দিদি সৌরসেনী মুখোপাধ্যায়। জাস্ট দু'মিনিটের বড়। পাশের ছেলেটি কবীর গঙ্গোপাধ্যায়। ডান দিকের মেয়েটি শ্রেয়া বন্দ্যোপাধ্যায়।"

"এটা মার্ডার না সুইসাইড? আপনার কী মনে হয়?"

"এটা অ্যাক্সিডেন্ট। চন্দ্রাণীর 'অ্যাক্রোফোবিয়া' ছিল। উঁচু জায়গা নিয়ে আতঙ্ক। রোগটার প্রধান লক্ষণ হল মাথা ঘোরা।"

"ওই কারণেই 'বাঁচাও' বলে চেঁচিয়েছিল?"

"আমি কিন্তু চিৎকারটা শুনিনি। সারা ক্ষণ দুটো টেলিস্কোপ নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম।"

"তা হলে কে শুনেছে?"

"সৌরসেনী ছাড়া কেউই শোনেনি। আর একটা কথা..."

"বলুন।"

ইতস্তত করে প্রসিত বললেন, "প্রতি ক্লাসে চন্দ্রাণী ফার্স্ট হত আর শ্রেয়া সেকেন্ড। পাঁচ দিন পরেই সেন্ট হেলেনা স্কুলে স্কলারশিপের পরীক্ষা আছে। ট্রাস্টি বোর্ড থেকে এক জনকেই পাঁচ লাখ টাকার প্রাইজ় মানি দেওয়া হয়। চন্দ্রাণী না থাকায় সেটা শ্রেয়া পাবে।"

ফোনে মেসেজ ঢুকেছে। মোবাইলে চোখ বুলিয়ে সুনীল বললেন, "সৌরসেনীকে ডাকুন।"

॥ ৩ ॥

লম্বা, ফরসা ও বলশালী মেয়েটি পরে আছে ট্র্যাকসুট আর স্নিকার, হাতে মোবাইল। চোখে-মুখে ভয় বা শোকের লেশ মাত্র নেই। নিঃশব্দে বাবল গাম চিবোচ্ছে।

"তোমাদের নাম সূর্য আর চাঁদ নিয়ে কেন?" করমর্দনের জন্যে হাত বাড়ালেন সুনীল।

""আদা আর কাঁচকলা হলে ভাল হত?" জোরালো হ্যান্ডশেক সেরে বিরক্ত মুখে বলল সৌরসেনী, "এনিওয়ে, নাম দুটো বাপির দেওয়া। বাপিকে ডাকব?"

"ওর বাবা গোয়ার চিফ সেক্রেটারি," বিনয়ের সঙ্গে বললেন প্রসিত, "এখন আকাশলীনাতেই আছেন। নিয়মনিষ্ঠ মানুষ, তাই ক্রাইম সিনে আসেননি।"

সুনীল জোরে জোরে বললেন, "এটা কোনও ক্রাইম সিন নয়। এখানে কোনও ক্রাইম হয়নি। এক জনের অ্যাক্সিডেন্টাল
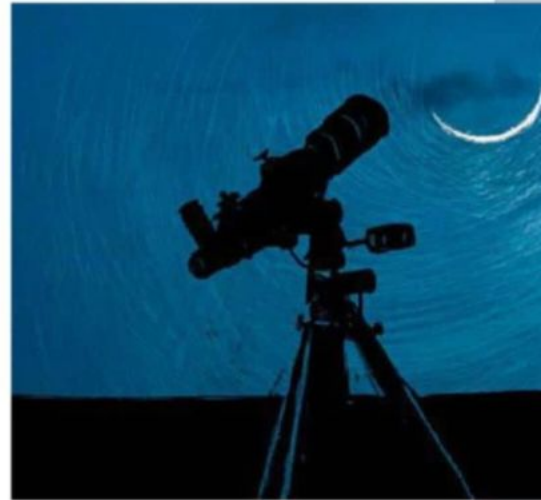
ফল হয়েছে।"

তাঁর কথা শুনে উপস্থিত সবার দুশ্চিন্তা কিছুটা হালকা হয়েছে। সেটা বুঝতে পেরে সুনীল নরম গলায় সৌরসেনীকে প্রশ্ন করলেন, "যখন দিদি চেঁচাল, তখন তুমি কী করছিলে?"

"আমি টেলিস্কোপে চোখ দিয়ে লুনার একলিপ্স দেখছিলাম। চিৎকার শুনে দেখি

ও আর নেই।”

“তখন বাকিরা কোথায় ছিল?”

“সে ভাবে খেয়াল করিনি। আশপাশেই ছিল।”

“তুমি কি খেলাধুলো করো?” প্রসঙ্গ বদলেছেন সুনীল।

“সুইমিং করি। আপনি যেমন টিকটিকিগিরি করেন,” সৌরসেনী আক্রমণাত্মক।

“তোমার যা চেহারা, রোগা-পাতলা দিদিকে ধাক্কা দেওয়া তো খুব সোজা।”

“দিদিকে কখন দেখলেন? আমি তো শুনলাম আপনি এগারো তলা থেকে সোজা এসেছেন।”

“তোমার বাবা যে ভাবে তোমাকে আমার পেশার খবর পাঠিয়েছেন, একই ভাবে কলকাতা পুলিশও আমাকে মেসেজ করে তোমার খবর পাঠিয়েছে,” ঠান্ডা মাথায় বললেন সুনীল।

“তোমরা যমজ ঠিকই, তবে তোমাদের দেখতে আলাদা, ব্যবহারও আলাদা। দিদি শান্তশিষ্ট, তুমি দুরন্ত। দিদি পড়াশোনায় খুব ভাল, তুমি বিলো অ্যাভারেজ। ওজনদার বাবা না থাকলে সেন্ট হেলেনা স্কুল তোমাকে রাখত না। দিদি আর বোনের আকচা-আকচি নিয়ে পেরেন্ট-টিচার মিটিংয়ে বার বার কথা হয়েছে। দিদিকে ধাক্কা মারার যথেষ্ট কারণ তোমার আছে। যাই হোক! কবীরকে পাঠিয়ে দাও।”

সৌরসেনী হঠাৎ গলা নামিয়ে বলল, “কবীরের কাছে দিদি দশ লাখ টাকা পেত। গড়িয়াহাটে গ্রহ-রত্নের দোকান খুলবে বলে কোভিডের আগে খুব নেচেছিল। ওর বাবা কানাকড়িও ঠেকায়নি। কবীর তখন দিদির কাছ থেকে ধার নেয়। সেটা আর ফেরত দিতে হবে না।”

“চন্দ্রাণী অত টাকা পেল কোথা থেকে?” সুনীল অবাক।

“আমরা বড়লোক। এটা ভুলে যাবেন না!” চলে গেল সৌরসেনী।

॥ ৪ ॥

কবীরের কাঁধে হাত রেখে প্রসিত বললেন, “রেজ়াল্ট বেরোলেই ছেলেটা উড়ে যাবে সোজা ‘লন্ডন স্কুল অফ অ্যাস্ট্রোলজি’। ওর বাবা ইউকে এমব্যাসিতে আছেন।”

কবীরের মুখময় দাড়ি-গোঁফ। পরনে ধুতি-পাঞ্জাবি। খালি পা, কপালে হলুদ টিকা, হাতে মোবাইল। হ্যান্ডশেক সেরে সুনীল বললেন, “তোমার আঙুলে একাধিক আংটি দেখছি। সময় খারাপ যাচ্ছে?”

“আমি অ্যাস্ট্রোলজির চর্চা করি,” বয়সের তুলনায় কবীরের গলা বেশ ভারী।

সুনীল মৃদু হেসে বললেন, “জ্যোতিষী হয়ে জ্যোতির্বিজ্ঞানের চর্চা করছ?”

কবীর তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলল, “গ্রহ-নক্ষত্রের অবস্থান বিচার করে মানুষের ভাগ্য গণনা করতে গেলে শিক্ষা, পরিশ্রম আর মেধা লাগে। জ্যোতিষী হওয়া ইজ় নট আ ম্যাটার অফ জোক।”

“চন্দ্রাণী যখন খুন হয় তখন কী করছিলে?” প্রসঙ্গ বদলালেন সুনীল।

“খুনের সময় আমি ফোনে কথা বলছিলাম... আই মিন... এটা খুন না অ্যাক্সিডেন্ট জানি না...” ঘাবড়ে গিয়ে তোতলাচ্ছে কবীর, “ঠিক ক’টার সময় ঘটনাটা ঘটেছিল বলতে পারব না। তবে আমি বাবার সঙ্গে কথা বলছিলাম।”

“বাকিরা তখন কী করছিল?”

মেঝের দিকে তাকিয়ে কবীর বলল, “ওই ভাবে খেয়াল করিনি।”

“পড়াশোনার পরে দেশে ফিরবে না লন্ডনে থেকে যাবে?” আবার প্রসঙ্গ বদলেছেন সুনীল।

“২০১৯ সালে একটা ব্যবসা শুরু করেছিলাম,” ধাতস্থ হয়েছে কবীর, “যাবতীয় সমস্যার সমাধানে গ্রহ-রত্নের শোরুম। কোভিড আসায় পুরো টাকা জলে যায়। পোস্ট-কোভিড জমানায় শোরুম-ফোরুম আর চলবে না। একটা অ্যাপ লঞ্চ করার তালে আছি। পড়া সেরে দেশেই ফিরব। ইন্ডিয়ায় অ্যাস্ট্রোলজির বিশাল মার্কেট।”

“দোকানটা খোলার জন্যে চন্দ্রাণীর কাছ থেকে দশ লাখ টাকা ধার নিয়েছিলে। টাকাটা যাতে ফেরত দিতে না হয়, তার জন্যে ওকে ধাক্কা দেওয়াটা ঠিক হল?”

কবীর মরা মাছের মতো চোখ করে সুনীলের দিকে তাকিয়ে বলল, “আমি চন্দ্রাণীকে মারিনি,” তার পরে ফিস ফিস করে বলল, “আপনার মোবাইল নম্বরটা দিন। কুইক!”

সুনীল ভুরু কুঁচকে কবীরের দিকে তাকিয়ে মোবাইল নম্বর বললেন। কবীর সেটা সেভ করে নিল। সুনীল বললেন, “শ্রেয়াকে পাঠিয়ে দাও।”

॥ ৫ ॥

শ্রেয়া দেখতে বালিকাসুলভ। বারো বছরের মেয়ে বলে চালিয়ে দেওয়া যায়। সে পরে আছে কুর্তি, লং স্কার্ট আর কোলাপুরি চপ্পল। গলার কাপড়ের বটুয়ায় ঝুলছে মোবাইল। সুনীলের সঙ্গে হাত মিলিয়ে বলল, “পুলিশ এসে গেছে। আর আপনার এখানে থাকার দরকার নেই।”

সুনীল খেয়াল করেননি যে, চিনার এসে তাঁর পিছনে চুপ করে দাঁড়িয়েছেন। সুনীল চেয়ার থেকে উঠে বললেন, “স্যর! কখন এলেন?”

“এক্ষুনি,” হাসলেন চিনার, “আপনার মোবাইলে ভিক্টিমের ফটো পাঠিয়েছি। ফরেন্সিক টিমও এসে গেছে। ওরা সব এভিডেন্স কালেক্ট করে ডেডবডি পাঠিয়ে দিচ্ছে বেঙ্গল মেডিক্যাল কলেজে, পোস্ট-মর্টেমের জন্যে।”

সুনীল হোয়াটসঅ্যাপে আসা চন্দ্রাণীর ফটোগুলো দেখলেন। তার পর কবীরের পাঠানো মেসেজগুলো পড়ে মোবাইল পকেটে রাখলেন।

চিনার ইতিমধ্যে সঙ্গে থাকা ফরেন্সিক টিমের মহিলা পুলিশ পিয়ালীকে নির্দেশ দিয়েছেন, প্রত্যেকের দেহ তল্লাশি করার জন্যে। ছেলেমেয়েরা রেগে কাঁই হলেও যে যার মোবাইল আর মানিব্যাগ দিয়ে দিল। কবীর টুক করে বলল, “সবার থেকে পাসওয়ার্ডগুলো নিন।”

প্রসিত নিজেই মোবাইল, মানিব্যাগ আর চাবির গোছা পিয়ালীর হাতে তুলে সুনীলকে বললেন, “আমাকেও ফ্রিস্ক করুন স্যর।”

সুনীল ওঁর হাত, পা আর গায়ে রুটিন হাত বুলিয়ে শ্রেয়ার দিকে তাকিয়ে বললেন, “তোমার কী মনে হয়? বন্ধু কী ভাবে মারা গেল?”

শ্রেয়া শ্রাগ করে বলল, “ক্লাসমেট মানেই বন্ধু নয়। আমি ওকে জাস্ট চিনতাম। কী করে মারা গেল জানি না। আমি তখন রিল বানিয়ে ইনস্টায় পোস্ট করছিলাম। আমার মোবাইল আপনাদের কাছে। দেখে নিতে পারেন।”

“অন্যরা তখন কী করছিল?”

"খেয়াল করিনি। অন্ধকারে বোঝাও যাচ্ছিল না। তবে আমি কোনও চিৎকার শুনতে পাইনি।"

"ক্লাসমেট কি খুন হয়েছে?"

শ্রেয়া আড়চোখে দেখে নিল যে প্রসিত আর চিনার কথা বলছেন। সে গলা নামিয়ে বলল, "হতেই পারে। ও খুন হলে অনেকের সুবিধে।"

"তোমার তো খুবই সুবিধে। স্কলারশিপের পাঁচ লাখ টাকা ইজ় নট আ ম্যাটার অফ জোক।"

"আমাকে নিয়ে টানাটানি করছেন কেন?" হিসহিস করে বলল শ্রেয়া, "সৌরসেনীর সঙ্গে ওর বাজে লেভেলের 'সিবলিং রাইভালরি' ছিল। একে অন্যকে টলারেট করতে পারত না। অন্য দিকে চন্দ্রাণী মরলে কবীরের বিশাল ফিনানশিয়াল গেন।"

এর মধ্যে প্রসিত চলে এসেছেন। তিনি বললেন, "কী রে! রেগে আছিস কেন? উত্তেজনায় ব্লাড প্রেশার বেড়ে যায়। চল চল! গ্রহণ প্রায় শেষ হয়ে এল। একটু পরেই চাঁদ দেখা যাবে। তখন সব অন্ধকার কেটে যাবে।"

সুনীল নিচু গলায় পিয়ালীর সঙ্গে কথা বলছিলেন। হঠাৎ গলা তুলে বললেন, "হ্যাঁ, গ্রহণ প্রায় শেষ! দু'-একটা কথা বলে অন্ধকারটা কাটিয়ে দিই।"

॥ ৬ ॥

সৌরসেনী বেশ জোরের সঙ্গে বলল, "বোকাটে রহস্য গল্প না ফেঁদে আপনি প্লিজ় যান। আমাদের লুনার একলিপ্স দেখতে দিন।"

"বোন মারা গেছে বলে তোমার কোনও দুঃখ হচ্ছে না?" জিজ্ঞেস করলেন সুনীল।

"হলেও পাবলিক প্লেসে সেটার বিজ্ঞাপন করতে রাজি নই। দুঃখ পার্সোনাল ফিলিং। রিল বানিয়ে বাজারে বেচার জন্যে নয়। আঙুলে পাথর পরে কমানোর জন্যেও নয়।"

"ডোন্ট টক অ্যাবাউট রিলস!" গলা তুলেছে শ্রেয়া।

"স্টোন নিয়েও কোনও কথা নয়," গম্ভীর গলায় বলল কবীর।

"আজ বরং চাঁদ নিয়ে কথা হোক," হাসলেন সুনীল, "চাঁদ সব সময়েই আমাদের সঙ্গে আছে। দিনে বা রাতে, অমাবস্যায় বা পূর্ণিমায় সে আছে। পূর্ণ বা আংশিক গ্রহণে আছে। দেখা না গেলেও আছে। চাঁদ হল 'সত্যি'র মতো। সত্যি লুকিয়ে থাকে এক গাদা মিথ্যের আড়ালে। শুধু খোঁজার কায়দা জানতে হয়।"

"পচা হ্যাজ নামানো বন্ধ করুন," কড়া গলায় বলল শ্রেয়া।

"চন্দ্রাণীকে খুন করার মোটিভ কার কার ছিল? সবার। কার কার ফুলপ্রুফ অ্যালিবাই আছে? কারও নেই। কোনও ক্লু বা সাক্ষী আছে? বোঝা যাচ্ছে না। কাজেই প্রথাগত ভাবে যে খুনিকে খুঁজে বের করা যাবে না, সেটা আমি ছাদে আসার আগেই আন্দাজ করেছিলাম। তাই এই কেসটা সল্‌ভ করার জন্যে জাস্ট একটা আইডিয়া নিয়ে এসেছিলাম। যে আইডিয়ার কথা একটু আগে প্রসিত বলে দিয়েছেন। উত্তেজনার সময় পাল্‌স রেট, ব্লাড প্রেশার, হার্ট রেট, শ্বাসের গতি— সব বেড়ে যায়। যাকে বলে 'অ্যাড্রিনালিন রাশ।' সত্য গোপন এবং মিথ্যা ভাষণের পাপবোধ সারা ক্ষণ চলতে থাকে খুনির মাথায়। তার প্রভাব পড়ে শরীরে। সেই জন্যে এখানে এসেই সবার সঙ্গে হ্যান্ডশেক করি। তাতেই দেহের তাপমাত্রা, ঘামের পরিমাণ, পাল্‌স রেটের আন্দাজ পেয়েছিলাম। উত্তেজিত ছিল সবাই। কিন্তু খুনির ক্ষেত্রে সেটা পারসিস্ট করেছে।"

সুনীলের হাতে একটা স্মার্টফোন দিয়ে পিয়ালী বলল, "হেল্‌থ ট্র্যাকার অ্যাপে দেখাচ্ছে যে পাল্‌স রেট গত পঁয়তাল্লিশ মিনিট ধরে একশো কুড়ি, ব্লাড প্রেশার একশো আশি বাই একশো। শ্বাস চলছে মিনিটে তিরিশটা। এ তো একশো মিটারের এনার্জি নিয়ে ম্যারাথন দৌড় চলছে!"

"করমর্দন আর বডি সার্চের সময়েই খেয়াল করেছি," বললেন সুনীল, "এর ব্যাখ্যা, প্রসিতবাবু?"

প্রসিতের হাঁফানি প্রকট হয়েছে, "আমিই তো বললাম যে চন্দ্রাণীর ভার্টিগো ছিল। আমি তো বললাম যে 'বাঁচাও' চিৎকারটা সৌরসেনী ছাড়া অন্য কেউ শুনতে পায়নি।"

"যেটা আপনি বলেননি সেটা হল, চন্দ্রাণী আপনাকে ব্ল্যাকমেল করছিল," কেটে কেটে বললেন সুনীল, "ডিআরডিও-র সায়েন্টিস্ট হয়ে প্রতিবেশী দেশের এজেন্টকে দেশের গুরুত্বপূর্ণ প্রতিরক্ষা বিষয়ক নথি বিক্রি করছিলেন। সেটা চন্দ্রাণী জেনে যায়। আজকের চন্দ্রগ্রহণ দেখানোর ইভেন্টকে তাই হত্যামঞ্চ হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন।
তা-ই না?"

প্রসিতের মুখ কুঁচকে গেছে। তিনি হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, "জাস্ট এই ফালতু আইডিয়াটা দিয়ে আমাকে ধরবেন? আপনি কি উন্মাদ?"

"আপনিই যে চন্দ্রাণীকে খুন করেছেন সেটা আপনাকে দিয়ে স্বীকার করিয়ে নেওয়ার কাজ পুলিশের। কোন পদ্ধতিতে, ঠিক সময়ে জেনে যাবেন। খুনের পাশাপাশি দেশদ্রোহিতার অভিযোগও উঠবে আপনার নামে। এ জীবনে আর জেল থেকে ছাড়া পাবেন না।"

প্রসিতের মাথা ঝুলে গেছে। মুখে অন্ধকার নেমে এসেছে।

"তোমাকে ধন্যবাদ!" কবীরের দিকে তাকিয়েছেন সুনীল, "কারণ তুমিই আমাকে মেসেজ করে জানালে, প্রসিতের বিশ্বাসঘাতকতার কথা। তবে আমার একটি আশঙ্কা আছে।"

"কী?" জিজ্ঞেস করল সৌরসেনী।

"কবীর ছাড়াও তোমাদের মধ্যে আর এক জন ব্ল্যাকমেলের কথা জানত। কিন্তু কবীরের মতো কথাটা সে আমাকে বলেনি। মোস্ট প্রোব্যাবলি তার প্ল্যান ছিল প্রসিতকে ভবিষ্যতে ব্ল্যাকমেল করা।"

"সেটা প্রমাণ করতে পারবেন?" বলল শ্রেয়া।

"প্রাইভেট ডিটেকটিভ হিসেবে প্রমাণ করার কোনও অধিকার আমার নেই। যা কিছু করার, পুলিশ করবে। তবে 'বাঁচাও' চিৎকারের কথাটা সৌরসেনী যদি না বলত তা হলে এটা 'অ্যাক্সিডেন্টাল ফল' হিসেবে ধরা হত। খুন ভাবা হত না। আসলে ওই চিৎকারটা চন্দ্রাণী করেইনি। সৌরসেনী চেয়েছিল খুনের রুটিন তদন্ত। যে নখদন্তহীন তদন্তে প্রসিত ধরা পড়বেন
না। তা হলেই ভবিষ্যতে ফাইল ওপেন করার ভয় দেখিয়ে ব্ল্যাকমেল করা যেত। তাই না সৌরসেনী?"

সৌরসেনী মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে। সুনীল বললেন, "এত ক্ষণে অন্ধকার পুরোটা কাটল। ওই দেখো, চাঁদ উঠেছে!"

ছবি: তারকনাথ মুখোপাধ্যায়

উড়ন্ত কফিন

সৈকত মুখোপাধ্যায়

জগিং থামিয়ে একটু দাঁড়ালাম। রিস্টওয়াচটা চোখের কাছে এনে সময় দেখলাম, সকাল ছ'টা বেজে সতেরো মিনিট। নিউ ইয়র্কের এই মফস্‌সল অঞ্চলটার নাম ব্যাটারি পার্ক। এখানে গাছপালা বেশি, আশপাশে বেশ কিছু জলাজমিও রয়েছে। সেই জন্য প্রতি বছরই শীতের শুরুতে ভোরের দিকে কুয়াশা পড়ে। কিন্তু আজকের মতো এমন ঘন কুয়াশা আমি

গত পাঁচ বছরে দেখিনি।

আমি পিটার সুলিভান। আমেরিকান ডিপ স্পেস প্রোগ্রামের ডেপুটি ডিরেক্টর। বয়স পঁয়তাল্লিশ বছর। পাঁচ বছর আগে নিউ ইয়র্কের সরকারি কোয়ার্টার ছেড়ে এই মফস্‌সলে নিজের বাড়ি বানিয়ে চলে এসেছি। যে পার্কটায় এখন হাঁটছি, এটার নামেই জায়গাটার নাম ব্যাটারি পার্ক। প্রতি দিন ভোরে আমি এখানে এসে এক ঘণ্টা শরীরচর্চা করে থাকি।

অন্যান্য দিন নানা বয়সের বহু নারী ও পুরুষ এখানে মর্নিং ওয়াক করতে আসেন। আজ কাউকেই দেখতে পাচ্ছি না। তারা আদৌ আসেননি, নাকি কুয়াশার আড়ালে ঢাকা পড়ে গেছেন বুঝতে পারছি না।

আজ একটাও পাখি ডাকছে না। শুধু টালি-বাঁধানো রাস্তার উপরে গাছের পাতা থেকে হিমের ফোঁটা ঝরে পড়ার অবিরাম টুপটাপ আওয়াজ। তা ছাড়া আর কোনও শব্দ নেই। অনেক দূর থেকে একটা কুকুর খুব করুণ গলায় কেঁদে উঠল।

নাহ, আজ আর বেশি ক্ষণ এখানে থাকব না। এমনিতেই পিছল রাস্তায় ঠিক মতো দৌড়োতে পারছি না। তা ছাড়া মনটাকে চিন্তামুক্ত করতে না পারলে শরীরচর্চা করে লাভও হয় না। আমি নিজেই বুঝতে পারছি, আজ আমার মন চিন্তামুক্ত নয়।

স্পেসশিপ আর্লিকে ফিরিয়ে আনার চিন্তা আমার পিছু ছাড়েনি।

স্পেসশিপ আর্লি। ব্ল্যাকহোল-ইঞ্জিন সিরিজ়ের প্রথম মহাকাশযান। তৈরি হয়েছিল ২৪৩০ সালে। ছোট্ট একটা মহাকাশযান আর তাতে এক জন মাত্র আরোহী। তিনিই পাইলট, তিনিই অনুসন্ধানী বিজ্ঞানী।

২৪৩০ সালের অগস্ট মাসে স্পেসশিপ আর্লি আমাদের নিকটতম নক্ষত্র প্রক্সিমা সেনটরির দিকে যাত্রা শুরু করে। এবং রওনা হওয়ার কিছু ক্ষণের মধ্যেই পথভ্রষ্ট হয়ে মহাশূন্যের বুকে হারিয়ে যায়। এটা খুব আশ্চর্য ব্যাপার নয়। যে-কোনও প্রোজেক্টের শুরুর দিকে এমন কিছু দুর্ঘটনা ঘটেই থাকে। পরের বছরগুলোয় আমেরিকান ডিপ স্পেস প্রোগ্রাম ক্রমশ আরও নিখুঁত হয়ে উঠেছিল।

আজ সত্তর বছর বাদে, এই ২৫০০ সালের নভেম্বর মাসে হঠাৎ করেই স্পেসশিপ আর্লি আবার আমাদের কাছে প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে। কারণ সত্তর বছর বাদে সে আবার পৃথিবীতে ফিরে আসছে।

হয়েছে কী, দিন সাতেক আগে আমাদের একটা আউটার স্টেশনের অবজ়ারভেটরি প্রথম খেয়াল করে, কোথা থেকে যেন আকাশে একটা অজানা স্যাটেলাইটের উদয় হয়েছে। সিকিয়োরিটির কারণেই তারা নানান ফ্রিকোয়েন্সির আইডেন্টিটি ট্যাগ দিয়ে সার্চ করতে-করতে আবিষ্কার করে যে, ওটিই সেই সত্তর বছর আগে হারিয়ে যাওয়া স্পেসশিপ আর্লি।

হিসেব করে দেখা গেল, হারিয়ে যাওয়ার সময় আর্লি সরলরেখার পথ ধরে চলে যায়নি। গিয়েছিল একটা বিরাট উপবৃত্তাকার পথে। ফলে সত্তর বছর অন্তর তাকে এক বার করে পৃথিবীকে মুখ দেখিয়ে যেতেই হবে।

যাই হোক, খবরটা পাওয়া মাত্রই আমি জেদ ধরে বসলাম, ওই স্পেসশিপটাকে পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে যেতে দেওয়া যাবে না। পৃথিবীতে ফিরিয়ে আনতে হবে।

আমাদের ডিরেক্টর এবং অন্য মেম্বারদের ভুরু কুঁচকে উঠল। তাঁরা প্রশ্ন করলেন, ''কেন?''

আমি বললাম, "ভেবে দেখুন। ইচ্ছেয় হোক, অনিচ্ছেয় হোক, ওই স্পেসশিপ আর্লিই এখনও অবধি মহাশূন্যের সবচেয়ে গভীরে ট্র্যাভেল করে ফিরছে। ওর ক্যামেরা, ওর প্রোব, এ সব যদি অক্ষত থাকে, তা হলে আমরা সামান্য খরচে অনেক অজানা তথ্য পেয়ে যাব।"

আমার সহকর্মীরা শুনে মুখ বেঁকালেন। আমিও জানতাম, সত্তর বছর ধরে মহাশূন্যে ছুটে চলেছে যে মহাকাশযান, তার অক্ষত থাকার আশা খুবই কম। তবু আর্লিকে ফিরিয়ে আনার খরচটাও যেহেতু খুবই সামান্য, তাই ওঁরা একটা চান্স নিয়ে দেখতে রাজি হয়ে গেলেন। কিন্তু পুরো অপারেশনের দায়িত্বটা ফেলে দিলেন আমার ঘাড়ে।

হাঁটতে হাঁটতে সেই সব দায়িত্বের কথাই ভাবছিলাম। হাতে আর বেশি সময় নেই। ঠিক সাত দিন বাদে আর্লি পৃথিবীর সবচেয়ে কাছাকাছি চলে আসবে, আর তখনই ওকে হুক করে ফেলতে হবে আমাদের মহাকাশফেরির সঙ্গে।

পার্কের গেট দিয়ে বাইরের সরু রাস্তাটায় বেরিয়ে এলাম। এই রাস্তাটার এক দিকে ওক গাছের সারি, আর-এক দিকে সেন্ট মেরিজ় গির্জার কাঠের বেড়া দিয়ে ঘেরা জমি। কুয়াশা এখনও এতটুকুও হালকা হয়নি। খুব সাবধানে পায়ের দিকে তাকিয়ে হাঁটছিলাম, যাতে হোঁচট না লাগে।

"গুড মর্নিং!"

নিজের চিন্তার মধ্যে ডুবে গিয়েছিলাম। তাই হঠাৎ ভারী গলায় ওই শুভেচ্ছা শুনে চমকে উঠলাম। তাকিয়ে দেখলাম, যিনি উইশ করলেন, তিনি গির্জার কাঠের বেড়ার গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। আমার থেকে দূরত্ব বড় জোর ছ'ফুট। কিন্তু কুয়াশার জন্য তাকে ভাল করে দেখতে পাচ্ছিলাম না।

অগত্যা তার দিকে দু'পা এগিয়ে গেলাম।

আমি এগিয়ে যেতেই ভদ্রলোকও দু'পা পিছিয়ে গেলেন। আশ্চর্য তো! পিছোলেন কেমন করে? উনি তো বেড়ার গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। চোখ দুটো রগড়ে নিয়ে আবার দেখলাম। না, আমারই ভুল। উনি বেড়ার ও দিকে দাঁড়িয়ে আছেন, গির্জার জমির উপর।

বললাম, "মর্নিং। আগে আলাপ হয়েছিল?"

"না। তবে আমি আপনাকে চিনি। মিস্টার সুলিভান, ডিপ স্পেস প্রোজেক্টের ডেপুটি ডিরেক্টর, রাইট?"

আমি কিছু না বলে হাসলাম। ভদ্রলোক এর পর কী বলেন, শুনতে চাইছিলাম। কিছু বলবেন তো নিশ্চয়ই। এমনি এমনি তো আর ডেকে দাঁড় করাননি।

তা বললেনও উনি। বললেন, "আমার নাম জিমি কলিন্স। বাবা মাইক কলিন্স," তার পর একটু ইতস্তত করে জিজ্ঞেস করলেন, "মাইক কলিন্স নামটা কি শোনা শোনা লাগছে?"

সত্যিই চেনা লাগছিল নামটা। মনে হচ্ছিল কয়েক দিন আগেই কোথাও এই নামের উল্লেখ দেখেছি। কিন্তু কোথায়?

ভদ্রলোক একটু অপেক্ষা করলেন। তার পর আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে বললেন, "স্পেসশিপ আর্লির পাইলট ছিলেন আমার বাবা, মাইক কলিন্স।"

ঠিক। স্পেসশিপ আর্লির নানান স্পেসিফিকেশনের উপরে যখন চোখ বোলাচ্ছিলাম, তখনই দেখেছিলাম, এক কোণে ছোট করে পাইলটের নামটাও লেখা আছে— মাইক কলিন্স। শুধু নামটাই, আর কিছু নয়। সেই জন্যেই মনে রাখতে পারিনি।

যাই হোক, শেক হ্যান্ড করার জন্যে হাতটা বাড়িয়ে দিলাম। উনি হাতটা ধরলেন না। ঠান্ডা গলায় বললেন, "তখন বাবার

বয়স কতই আর হবে? এক জন তরতাজা যুবক একটা ডিফেকটিভ রকেট চালিয়ে নিয়ে যেতে গিয়ে প্রাণটা হারাল। আর আজ আপনারা কত সহজে তাঁকে ভুলে গেছেন।"

আমি বলতে গেলাম, "দেখুন মিস্টার কলিন্স, বিজ্ঞানের ইতিহাসে এ রকম বহু..."

উনি আমার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বললেন, "এ রকম বহু গিনিপিগের প্রাণদানের কথা রয়েছে, তা-ই তো?"

বললাম, "ছিঃ। আমি তা বলতে চাইনি। আমি বলতে চেয়েছিলাম এ রকম মহত্ত্বের উদাহরণ অনেক। মাইক কলিন্সের মতো নিঃস্বার্থ মানুষদের বাদ দিয়ে সভ্যতা কখনও এগোতে পারে না।"

"আর তাদের বাড়ির লোকেদের কী হয়? এই যে ধরুন আমি, মাইক কলিন্সের ছেলে জিমি, বাবা যখন মারা গেলেন তখন তো আমার বয়স মাত্র ষোলো বছর। মা আগেই মারা গিয়েছিলেন। সারা জীবন আমি আর নিজের পায়ে দাঁড়াতেই পারলাম না।"

হঠাৎ জোরালো হাওয়ার একটা ঝাপটায় কুয়াশার চাদরটা এক মুহূর্তের জন্যে সরে গেল। আমি লোকটার মুখটা এই প্রথম বার ভাল করে দেখতে পেলাম।

সত্তর বছর আগে ওঁর বয়স ছিল ষোলো, তাই বললেন না? তার মানে এখন ওঁর বয়স হওয়া উচিত ছিয়াশি। উঁহু। বেড়ার ও দিকে যে-লোকটা দাঁড়িয়ে রয়েছে, তার বয়স কিছুতেই পঞ্চাশের বেশি হতে পারে না। তার মানে এ লোকটা ফ্রড, জোচ্চোর। এর সঙ্গে কথা বলার কোনও প্রয়োজনই নেই।

কথা শেষ করার জন্যেই আমি বললাম, "সত্যি, অন্যায় হয়ে গেছে। আচ্ছা চলি।"

দু'পা এগোতেই পিছন থেকে অনুনয়ের সুর ভেসে এল, "মি. সুলিভান। আমি আপনার কাছে একটা অনুগ্রহ চাইতেই আজ অতি কষ্টে এখানে এসে দাঁড়িয়েছি।"

লোকটার গলার স্বরে এমন একটা কাতরতা ছিল যে, আমি ঘুরে না-তাকিয়ে পারলাম না। বললাম, "বলুন।"

লোকটা বলল, "আপনি যা ভাবছেন, তা নয়। পয়সাকড়ি চাইব না। পয়সাকড়ির আর দরকার পড়ে না আমার।"

অস্বীকার করব না, বেশ চমকালাম। থট রিডিং জানে নাকি লোকটা?

লোকটা বলে চলল, "আমি শুধু করজোড়ে আপনাকে অনুরোধ করছি, স্পেসশিপ আর্লিকে নিজের কক্ষপথে চলে যেতে দিন। ওকে এখানে টেনে এনে খোলাখুলি করবেন না।"

ওর কথা শুনে আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। বলে কী? এ তো আমার প্ল্যানের গোড়ায় কুড়ুল বসাতে চাইছে। অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, "কেন? এ রকম অদ্ভুত আবদারের মানে কী?"

ও বলল, "দেখুন, স্পেসশিপ আর্লি তো নিছক একটা স্পেসশিপ নয়, ওটা আমার বাবার কফিন। গত সত্তর বছর ধরে ওই কফিনের মধ্যে মাইক কলিন্স শান্তিতে ঘুমোচ্ছেন। যে-কোনও সৎ নাগরিকের মতো মৃত্যুর পরে কবরের এই শান্তি তাঁর প্রাপ্য। আপনারা কেন তাঁর ঘুম ভাঙাবেন?"

আমি প্রমাদ গুনলাম। মুখে যা-ই বলুক, লোকটার ফন্দি খুব পরিষ্কার। এই সব আলতু-ফালতু কথা বলে ও এ বার পাবলিককে খ্যাপাবে। চাই কী, মিডিয়ার কাছেও দৌড়োতে পারে। তার পর আমাদের ব্ল্যাকমেল করবে। হয়তো একটা বিশাল টাকার বিনিময়ে স্পেসশিপ আর্লিকে খোলার অনুমতি দেবে।

আর পুরো ঘটনাটায় চাকরি নিয়ে টানাটানি হবে আমার... এই পিটার সুলিভানের, যেহেতু আর্লিকে পৃথিবীতে ফিরিয়ে আনার পুরো প্ল্যানটাই আমারই।

নিজের মনেই বললাম, 'মেজাজ হারালে চলবে না। মাথা ঠান্ডা রাখো সুলিভান।' তার পর খুব মিষ্টি করে ওকে বললাম, "আপনার চিন্তায় সামান্য একটু ভুল আছে, স্যর। স্বর্গত মাইক কলিন্স আদৌ কোনও কফিন পাননি। এত দিন উনি যেটার মধ্যে শুয়ে রয়েছেন সেটা তেল-কালির গন্ধ মাখা একটা আলমারির মতো জিনিস। এ বার আমরা ওঁকে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় এখানকারই কোনও একটা সমাধিক্ষেত্রে গোর দেব। আপনাকেও ডাকব সেই অনুষ্ঠানে। রাজি?"

আমার কথাগুলো শুনে জিমি খুব ঠান্ডা গলায় বলল, "মি. সুলিভান! কবর, কফিন, পরলোক, এই ব্যাপারগুলো আমি আপনার থেকে অনেক ভাল বুঝি। একটা কথা শুনে রাখুন। মাটির দশ হাত নীচে যে নৈঃশব্দ্য, তার চেয়েও অনেক বেশি নৈঃশব্দ্য ওই মাথার উপরে মহাশূন্যে। সেই নৈঃশব্দ্যের মধ্যে আমার বাবা ইতিমধ্যেই সত্তর বছর কাটিয়ে ফেলেছেন, আর আপনারা যদি ডিস্টার্ব না করেন তা হলে অনন্ত কাল ওখানেই কাটাবেন। কাজেই আবার অনুরোধ করছি, ওঁকে ছেড়ে দিন। লিভ হিম অ্যালোন!"

মুখে বলল বটে 'অনুরোধ', কিন্তু কথার সুরে একটু আগের সেই কাতরতা ছিল না। এ বার আমারও মেজাজ খারাপ হয়ে গেল। সোজা ওর চোখে চোখ রেখে বললাম, "সরি। এটা একটা সরকারি সিদ্ধান্ত। বদলানো সম্ভব নয়। গুড বাই।"

নানান কাজে সে দিন অফিস থেকে ফিরতে বেশ দেরি হল। সেন্ট মেরিজ় গির্জা আর ব্যাটারি-পার্কের মাঝের সরু রাস্তাটায় যখন টার্ন নিলাম, তখন ড্যাশবোর্ডের ঘড়িতে সময় দেখাচ্ছে রাত সওয়া ন'টা। ওখান থেকে আমাদের পাড়া আর পাঁচ মিনিটের রাস্তা।

এ বেলা আর একটুও কুয়াশা নেই কোথাও। তার বদলে চাঁদের আলোয় চার দিক ভেসে যাচ্ছে। অমন জোরালো জ্যোৎস্না ফুটেছে বলেই রাস্তার উপরে নানা রকমের গাঢ় কালো ছায়া ছড়িয়ে রয়েছে— গাছের ছায়া, বেড়ার খুঁটির ছায়া। হঠাৎ অনেক ছায়ার মধ্যে থেকে একটা ছায়াই যেন জ্যান্ত হয়ে রাস্তার মাঝখানে এসে দাঁড়াল। হেডলাইটের আলোয় মুখটা চিনতে পারলাম। জিমি কলিন্স।

আমি এতটাই চমকে উঠেছিলাম যে, মনে হচ্ছিল হৃৎপিণ্ডটা যেন লাফিয়ে আমার মুখের ভিতর দিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসবে। গাড়ির স্পিড কমই ছিল, তাই ব্রেক চেপে দাঁড় করাতে অসুবিধে হয়নি। কয়েক বার জোরে জোরে শ্বাস নিয়ে নার্ভগুলো শান্ত করলাম, তার পর গাড়ির দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে এলাম। জিমির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে দাঁতে দাঁত চেপে বললাম, "এটা কী ধরনের ইয়ার্কি? মনে রাখবেন, মানুষের ধৈর্যের একটা সীমা থাকে। আপনাকে আমি সকালেই তো বলে দিয়েছিলাম..."

লোকটা অদ্ভুত। মনে হল আমার কথাগুলো শুনতেই পায়নি। নিজের মনেই বলল, "আমি আপনাকে সকালে ঠিক বোঝাতে পারিনি, তাই আবার আসতে হল। দেখুন মি. সুলিভান, কবরের সঙ্গে আমাদের একটা অ্যাটাচমেন্ট তৈরি হয়ে যায়... একটা বন্ধন। আপনি যত সহজে বললেন না, বাবাকে একটা নতুন কবরে শুইয়ে দেবেন, ব্যাপারটা অত সহজ নয়। বাবা দুঃখ পাবেন, ভীষণ দুঃখ পাবেন। আমার সঙ্গে এ রকম ঘটনা ঘটলে আমিও পেতাম।"

এত ক্ষণে আমি নিঃসন্দেহ হয়ে গিয়েছিলাম যে, এই লোকটা বদমাশ

নয়। পাগল। তাই ওকে কাটানোর জন্যে তেড়েমেড়ে বললাম, “আপনি যা বলছেন, তার কোনও প্রমাণ আছে?”

ও একটু অবাক হয়ে আমার দিকে তাকাল। বলল, “কিসের প্রমাণ, কবরের প্রতি টানের? হ্যাঁ, আছে বইকি। আসুন, এ দিকে আসুন,” এই বলে আমার ডান হাতের কব্জিটা মুঠোর মধ্যে ধরে একটা টান দিল। বরফের মতো ঠান্ডা হাতটা আমার হাতের উপরে চেপে বসা মাত্রই আমার মাথার মধ্যে যে কী হয়ে গেল, আমি জানি না। আমি সম্মোহিতের মতো জিমির পিছন পিছন চলতে শুরু করলাম। আমার গাড়ি পড়ে রইল রাস্তার মাঝখানে।

সেন্ট মেরিজ় গির্জার বেড়ার গায়ে একটা ফাঁক। সেই ফাঁকের ভিতর দিয়ে আমরা পা রাখলাম গির্জার পিছন দিকে কবরখানায়।

ঢালু ঘাসের জমি ধীরে ধীরে উপরের দিকে উঠে গিয়ে গির্জার পিছনের দরজায় শেষ হয়েছে। সারা কবরখানা জুড়ে অসংখ্য কবর। অসংখ্য ছোট-বড় সমাধিফলক। জ্যোৎস্নায় ঘাসজমি জুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে শয়ে-শয়ে কালো ক্রুশের ছায়া। তার মধ্যে দিয়েই জিমি আমাকে টানতে টানতে নিয়ে চলল। তার পর অত্যন্ত সাদামাটা একটা উঁচু মাটির ঢিবির মতো কবরের দিকে আঙুল তুলে দেখিয়ে বলল, “ওই দেখুন, ওটা আমার কবর। চল্লিশ বছর ধরে আমি ওখানে মাটির নীচে শুয়ে রয়েছি। মাটির ওই টুকরোটুকু ছেড়ে আমার আর কোত্থাও যেতে ভাল লাগে না, নেহাত আপনি বাবার শান্তি নষ্ট করতে চলেছেন তাই...”

এই বলে আমার হাত ছেড়ে দিয়ে জিমি আস্তে আস্তে সেই কবরটার উপরে শুয়ে পড়ল। দেখলাম ভ্যাকুয়াম ক্লিনার যে ভাবে ধুলো শুষে নেয়, ঠিক সেই ভাবে প্রাচীন কবরটা ওর শরীরটাকে শুষে নিল। মাটির নীচ থেকে শেষ বারের মতো জিমির গলা ভেসে এল, “এর চেয়ে বড় প্রমাণ আপনাকে আর কী ভাবে দেব, আমি জানি না।”

আর সহ্য করতে পারলাম না। হঠাৎই আমার চোখের সামনে সব কিছু অন্ধকার হয়ে গেল। আমি জ্ঞান হারালাম।

খুব বেশি ক্ষণ নিশ্চয়ই ওই অবস্থায় পড়ে থাকিনি। বাড়ি ফেরার পরে আমার মেয়ে এক বার জিজ্ঞেস করেছিল, “তোমার জ্যাকেটের পিছনে ঘাসের কুচি লেগে আছে কেন?”

উত্তর দিইনি।

পরের দিন অফিসে গিয়েই আমার সেক্রেটারি বিলকে বলেছিলাম, “স্পেসশিপ আর্লির পাইলট মাইক কলিন্সের উত্তরাধিকারী কারা রয়েছেন একটু খোঁজ নাও তো।”

ও ঘণ্টা খানেক বাদে আমার চেম্বারে ঢুকে বলল, “কেউ নেই স্যর। ওঁর একটিই ছেলে ছিল, জিমি কলিন্স। স্পেসশিপ আর্লি যখন হারিয়ে যায়, তখন সেই ছেলের বয়স ছিল ষোলো বছর মাত্র। পরের তিরিশ বছর আমরা তাকে পেনশন দিয়েছিলাম। ছেচল্লিশ বছর বয়সে জিমিও একটা কার অ্যাক্সিডেন্টে মারা যান। সেন্ট মেরিজ় চার্চে যে তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়েছিল, সেই সার্টিফিকেটও ফাইলে রয়েছে। গির্জাটা তো আপনার বাড়ির কাছেই, তাই না?”

আমি সেই প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে বললাম, “শোনো, অপারেশন আর্লি ইজ় অ্যাবানডান্ড। ডিরেক্টর এবং অন্য মেম্বারদের জানিয়ে দাও, সব দিক বিবেচনা করে আমি আর্লিকে ফিরিয়ে আনার প্রস্তাব উইথড্র করছি। হ্যাঁ, তুমিই জানিয়ে দাও। আমি বাড়ি চললাম। শরীরটা ভাল নেই।”

ছবি: মহেশ্বর মণ্ডল

আমার ছবি

দ্যাখো, ভাবো আর আঁকো

ছবি আঁকতে সবাই ভালবাসে। তাই এই ছবি আঁকার বিভাগ। এখানে আঁকা অসমাপ্ত ছবিটা শেষ করো দেখি। আঁকা শেষ হলে রং করে ফ্যালো ছবিটাকে।

ছবি: কুনাল বর্মণ

ফারাক পাও

২টি ছবিতে অন্তত ৮টি অমিল রয়েছে। প্রথমে নিজেরা খুঁজে বের করো। তার পর আগামী সংখ্যায় দেওয়া উত্তরের সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ো।

ছবি : প্রসেনজিৎ নাথ

উত্তর: ৫ অক্টোবর সংখ্যায়

সুদোকু

৮		৪		৭		৯		২
		১	৮		২	৭		
	৭						৪	
৯			৬		৩			৫
১			৭		৯			৬
	৫						৮	
		৬	৯		৮	২		
৩		৭		২		৬		১

এখানে ৯টি ঘরের একটি বর্গক্ষেত্রে ১ থেকে ৯-এর মধ্যে কিছু সংখ্যা বসানো আছে। ফাঁকা ঘরগুলোয় তোমাদের বাকি সংখ্যা এমন ভাবে বসাতে হবে, যাতে পাশাপাশি এবং উপর-নীচে কোনও লাইনে, এমনকি, ছোট-ছোট বর্গক্ষেত্রগুলোর মধ্যে ১ থেকে ৯-এর মধ্যে কোনও সংখ্যা যেন দু'বার না বসে!

৪	১	২	৩	৯	৭	৬	৫	৮
৭	৬	৮	৪	২	৫	১	৯	৩
৩	৫	৯	৮	১	৬	৭	৪	২
২	৯	১	৭	৮	৪	৩	৬	৫
৬	৪	৩	২	৫	৯	৮	১	৭
৮	৭	৫	১	৬	৩	৪	২	৯
৯	৩	৬	৫	৪	৮	২	৭	১
১	৮	৪	৯	৭	২	৫	৩	৬
৫	২	৭	৬	৩	১	৯	৮	৪
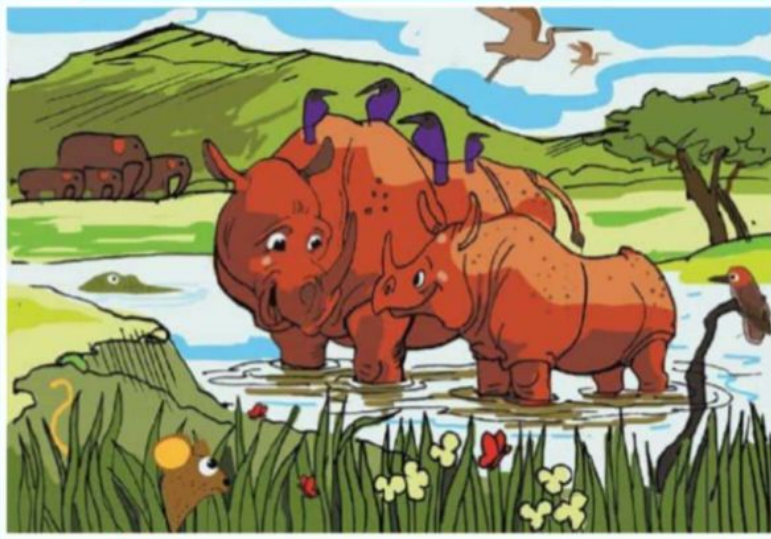
গত সংখ্যার উত্তর

১। নৌকার অভিমুখ বদলে গেছে।
২। দাঁড়ানো হরিণের চোখ বুজে এসেছে।
৩। সমুদ্রের মাঝে একটা বালির চড়া দেখা গেছে।
৪। গাছে চারটে লাল পাখি এসেছে।
৫। সমুদ্রের পারে একটা ঘর দেখা গেছে।
৬। ঝোপে কিছু হলুদ ফুল দেখা গেছে।
৭। একটি নদীর ধারা দেখা গেছে।
৮। দূরের আকাশে এক টুকরো মেঘ দেখা গেছে।

দীপসুন্দর দিন্দা

আনন্দমেলার কুইজ় বিভাগের প্রশ্ন করছেন 'দাদাগিরি আনলিমিটেড সিজ়ন সিক্স'-এর বিজয়ী দীপসুন্দর দিন্দা।

1 বাংলা সাহিত্যের ভোম্বল সর্দার চরিত্রটির স্রষ্টা কে?

2 টেনিসের ওপেন যুগে সবচেয়ে বেশি বয়সে কোনও গ্র্যান্ড স্ল্যাম টুর্নামেন্টের ফাইনালে ওঠার বিশ্বরেকর্ড করলেন কোন ভারতীয় টেনিস খেলোয়াড়?

সত্যজিৎ রায়

8 সৌরসেনা, গণেশানুজ, স্কন্দ, আম্বিকেয়, তারকারি, ষড়ানন কোন দেবতার বিভিন্ন নাম?

9 সত্যজিৎ রায় পরিচালিত 'সোনার কেল্লা' ছবিতে মন্দার বোসের চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন কোন অভিনেতা?

3 ইসরোর এই মহিলা বিজ্ঞানীর কণ্ঠেই শোনা যেত বিভিন্ন রকেট উৎক্ষেপণের কাউন্টডাউন ঘোষণা। সম্প্রতি তিনি প্রয়াত হয়েছেন। নাম কী?

রকেট উৎক্ষেপণ (প্রতীকী ফটো)

4 এ বছর স্ট্রিট চাইল্ড ক্রিকেট ওয়ার্ল্ড কাপ ভারতের কোন শহরে অনুষ্ঠিত হবে?

5 'ডায়াবিটোলজিস্ট অফ দ্য ইয়ার ২০২৩', জাতীয় স্তরের এই স্বীকৃতিটি সম্প্রতি জিতলেন কে?

6 কপড়াগন্ডা শাল ও কালাজিরা রাইস সম্প্রতি জিআই ট্যাগ পেল। এগুলো কোন রাজ্যের?

7 সম্প্রতি প্রয়াত হয়েছেন বিশ্ব ক্রিকেটের স্বনামধন্য এক অলরাউন্ডার, হিথ স্ট্রিক। তিনি কোন দেশের খেলোয়াড় ছিলেন?

হিথ স্ট্রিক

10 বিশ্ব ওজ়োন দিবস পালিত হয় কত তারিখে?

৫ সেপ্টেম্বর সংখ্যার উত্তর

১। জীবনের হিসাব।
২। সর্দার বল্লভভাই পটেল।
৩। অদিতি গোপীচাঁদ স্বামী।
৪। গৌরকিশোর ঘোষ।
৫। রেসপিরেটরি সিস্টেম বা শ্বসন যন্ত্রের চিকিৎসক।
৬। ৯ অগস্ট।
৭। পাবলো পিকাসো।
৮। কেরল।
৯। পালকি।
১০। আমেরিকা।

সঠিক উত্তরদাতা

মৈনাক গায়েন, *সপ্তম শ্রেণি, বালিচক ভজহরি ইনস্টিটিউশন, পশ্চিম মেদিনীপুর।*
রিত্বিষা পাত্র, *সপ্তম শ্রেণি, সেন্ট জোসেফ্স কনভেন্ট, চন্দননগর, হুগলি।*
উদ্দীপ্ত রানা, *সপ্তম শ্রেণি, বিবেকানন্দ বিদ্যাপীঠ (উঃ মাঃ), মুরাদপুর, পূর্ব মেদিনীপুর।*
সৌম্যকান্ত সেন, *সপ্তম শ্রেণি, পার্ল রোজ়ারি ইস্কুল, ডানকুনি, হুগলি।*
বৈশালী পোদ্দার, *অষ্টম শ্রেণি, অগজ়িলিয়াম কনভেন্ট স্কুল, ব্যান্ডেল।*
বিতান পোদ্দার, *সপ্তম শ্রেণি, ডন বস্কো স্কুল, ব্যান্ডেল।*
অনিরুদ্ধ সরকার, *ষষ্ঠ শ্রেণি, দিল্লি পাবলিক স্কুল, পূর্ব বর্ধমান।*
অনিরুদ্ধ সিংহ, *সপ্তম শ্রেণি, বনগ্রাম উচ্চ বিদ্যালয় (উঃ মাঃ), বনগাঁ, উত্তর ২৪ পরগনা।*

উত্তর পাঠাও ২৫ অক্টোবরের মধ্যে, anandamelamagazine@gmail.com এই ঠিকানায়।
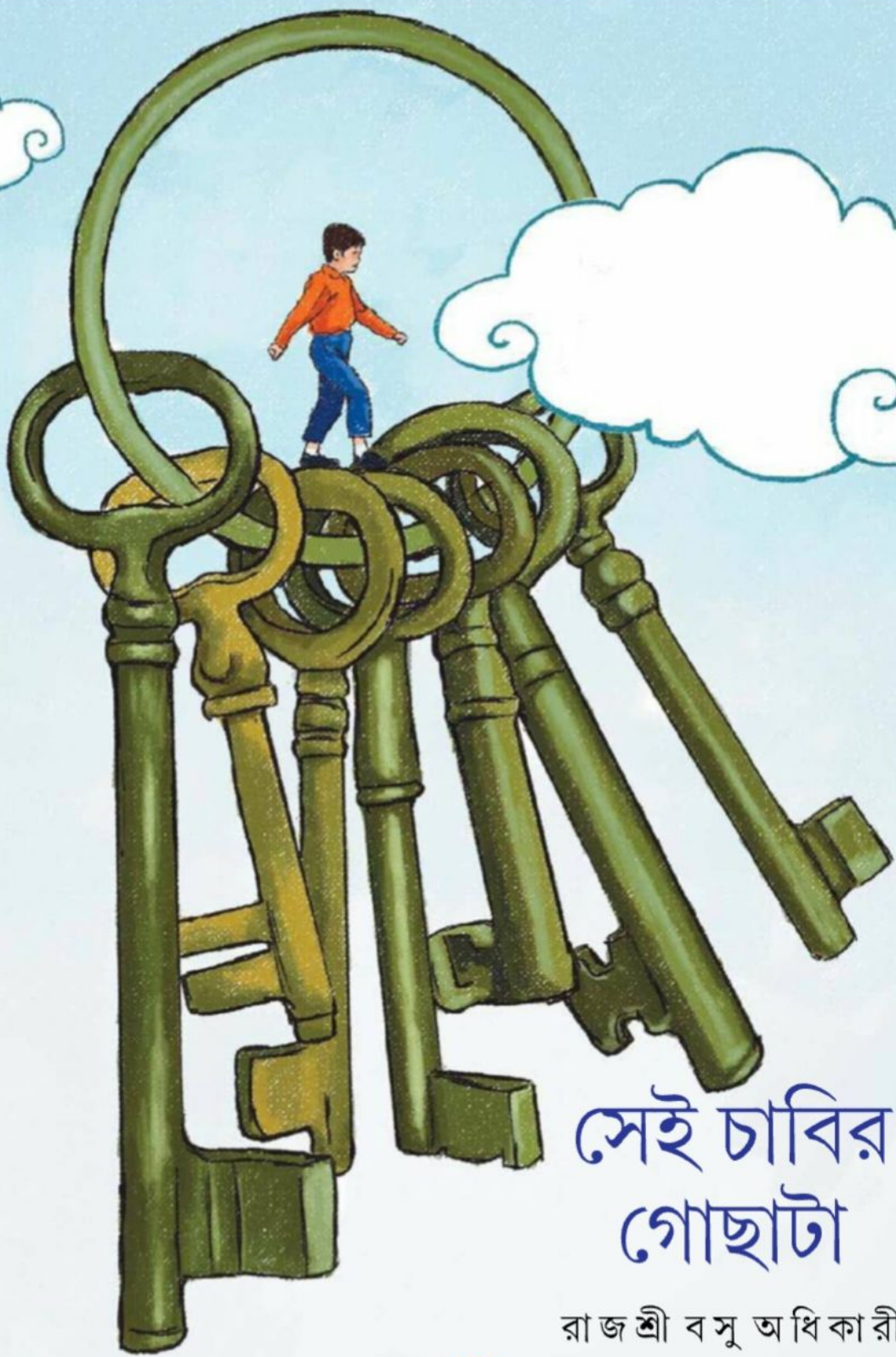
সেই চাবির গোছাটা

রাজশ্রী বসু অধিকারী

পিকুর হাতে চাবির গোছা ছিল। জং ধরা গোল রিং, তাতে অন্তত আট-দশটা নানা চেহারার চাবি। সিঁড়িতে বসে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখছিল পিকু। এই চাবির গোছাটা সব সময় দাদুর কোমরে গোঁজা থাকত, নয়তো বগলে ধরে থাকা ছাই রঙের ফোলিয়ো ব্যাগটার মধ্যে। মনের মধ্যে জেগে থাকা খুব ছোটবেলার কয়েকটা ছবির মধ্যে এটাও একটা। ও দাদুর বিশাল ডেস্কের উল্টো দিকের চেয়ারে বসে আছে, আর দাদু ব্যাগ থেকে

এই চাবির গোছা বের করে চার থাক ড্রয়ারের মধ্যে কোনও কোনওটা খুলে বের করে আনছে নোটবই, ডায়েরি, চিঠির তাড়া বা টাকার বান্ডিল। হয়তো সামনে দাঁড়ানো দিদা, বড়মামা, পলুমামা বা মিনুমাসি। অথবা হরিকাকু বাজার যাবে, ব্যাগ হাতে এসে দাঁড়িয়েছে টাকা নিতে, অথবা অন্য কেউ। যার যা কাজ সব দাদু এই চাবি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে মিটিয়ে দিত। মনে আছে পিকুর।

এই চাবির গোছার উপর পাঁচ বছরের পিকুর ছিল অসীম আকর্ষণ। বার বার হাত বাড়িয়ে দিত দাদুর দিকে। ধরতে চাইত নিজের হাতে। এক-এক সময় হাতে পেত বইকি। দাদু যখন একা থাকত, যখন তার হাতে কাজ থাকত না, পিকুকে কোলের কাছে নিয়ে এক হাতে জড়িয়ে ধরে আর-এক হাতে ওর ছোট ছোট মুঠির মধ্যে গুঁজে দিত চাবির গোছা। আর পিকুর মনে হত সমস্ত সম্পত্তির মধ্যে এই হল সাত রাজার ধন, যা ওর পাওয়া হয়ে গেল। দু'হাতে আঁকড়ে থাকত হাসি মুখে। হ্যাঁ, মনে আছে স্পষ্ট! কিন্তু খুব বেশি ক্ষণ নয়। একটু পরেই দাদু আবার নিয়েও নিত। বলত, "তুমি বড় হও দাদুভাই, তোমাকেই দিয়ে যাব এই রাজত্ব আমার।"

পিকু বুঝত না, রাজত্ব মানে কী। ওর মনে হত, ও তো রাজত্ব চায়নি, চাবির গোছাটাই শুধু চেয়েছে।

এখন পিকুর তেরো বছর বয়স। আগামী বছর বোর্ডের পরীক্ষা দেবে। গত দু'বছর ধরে এই মেমারি গ্রামে আর আসাই হয়নি। ছোটবেলায় পিকু দাদুর বাড়িতেই থাকত। তখন বাবা ছিল জাহাজের চাকরিতে। মাঝে মাঝে আসত এখানেই। সেই ক'দিন হত উৎসব। সারা দিন হইহই, খাওয়াদাওয়া, বেড়ানো আর মজা। তার পর বাবা চলে গেলে আবার আগের রুটিন। পিকু আবার দাদু-দিদা, মামা-মামিদের কোলে-পিঠে। সবাই ছিল ওর, শুধু মা ছিল না। তাই বোধ হয় সবাই ওকে বেশি বেশি ভালবাসত। তার পর তিন বছর আগে বাবার কোচিতে পোস্টিং হওয়ার পরেই ওকে নিয়ে গেল। তখন গ্রামের বাইরে যেতে পারছে বলে খুব আনন্দ হয়েছিল। কিন্তু তার পরেই বুঝেছে যে, এখানে কত ভাল ছিল ও। এই তিন বছরে এক বারও আর বাবা ওকে নিয়ে এল না। বাবা নতুন মা এনেছে বলেই কি এ বাড়ির সবার সঙ্গে আর সম্পর্ক রাখল না! কে জানে। তবে নতুন মা পিকুকে বেশ ভালবাসে। সে সব কথা পিকু দিদাকে ফোনে বলেওছে। কিন্তু বাবা আর আগের মতো এখানে আসে না। ওরও আসা হয় না।

তা হলে আজ কেন এসেছে? এসেছে কারণ দাদু চলে গেছে দশ দিন আগে। দাদু বার বার করে বলে গিয়েছিল, পিকুকে যেন এক বার ডেকে আনা হয়। যেন ওর হাতে তুলে দেওয়া হয় এই চাবির গোছা। দাদু নাকি ডায়েরিতে সব লিখে গেছে, কে কোনটা পাবে। ওরা এল গত পরশু দিন। গত কাল বিকেলে দিদা সবাইকে তার ঘরে ডেকে যার যার জিনিসপত্র, দলিল ইত্যাদি দিয়ে দিয়েছে। পিকু পেয়েছে এই চাবির গোছা। সেই থেকে এক মুহূর্তের জন্যও বোধ হয় এটা কাছছাড়া করেনি ও। বার বার দাদুর কথাগুলো মনে পড়ছে। এখন ও জানে, রাজত্ব মানে কী। কিন্তু কোনও রাজত্বের দিকে মন নেই ওর। শুধু জানার ইচ্ছে আছে, কী আছে দাদুর ওই দু'দিকে চার চার আটখানা বিশাল ড্রয়ার দেওয়া টেবিলটায়। ছোটবেলায় বার বার জানতে চাইত ও দাদুর কাছে, আর দাদু কত কী বলে যে ওকে ভুলিয়ে রাখত! আর ঠিক ঠিক মনে পড়ে না, কী বলত দাদু ওকে।

ওই ড্রয়ারগুলো খুলে দেখার ইচ্ছে আছে। দাদুর বসার ঘরটার সামনেই উপরে ওঠার সিঁড়ি। ছোটবেলায়ও দাদু যখন ওই ঘরে থাকত না, পিকু এই সিঁড়িতে বসেই নানা খেলায় ব্যস্ত থাকত অথবা গল্পের বই পড়ত। তার পর দাদু এসে ঘর খুলে বসলেই ভিতরে ঢুকে উল্টো দিকের চেয়ারে উঠে বসে পড়ত। কিংবা দাদুর কোলের কাছে গুটিসুটি মেরে দাঁড়িয়ে থাকত। আজকেও সেই সিঁড়িতেই বসে আছে পিকু। পার্থক্য শুধু এই যে, আজ আর দাদু নিজের কাজ সেরে ওই ঘরে এসে বসবে না, ডাকবে না 'দাদুভাই' বলে।

তখন এই বাড়িটায় কত লোক ছিল। এখন কেমন ফাঁকা ফাঁকা। বড়মামা মারা গিয়েছিলেন পিকু এখানে থাকতে থাকতেই। মিনুমাসিরও বিয়ে হয়ে গিয়েছিল তার এক বছর পর। পলুমামা নাকি বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে কোথায়... দাদুর সঙ্গে ঝগড়া করে গিয়েছে বলে শুনেছে পিকু। কিন্তু দাদু মারা যাওয়ার খবর পেয়ে আবার এসেছে। আগে পলুমামা কত ভালবাসত ওকে। কিন্তু এ বার একটাও কথা বলল না। আরও একটা আশ্চর্যের ব্যাপার যে, পলুমামার বৌ ওকে দেখেই মুখের উপর নিজের ঘরের দরজাটা বন্ধ করে দিল। পিকুকে কি চেনে না পলুমামি? নাকি ভুলে গেছে ওকে? হবে হয়তো। বাবাকে জিজ্ঞেস করলে জানা যেত। কিন্তু বাবাও এ বার এখানে থাকছে না। ওকে দিয়েই আবার বর্ধমানে চলে গেছে। কোথায় কোথায় ঘুরে বেড়াচ্ছে কে জানে! কয়েক দিন পর এসে আবার নিয়ে যাবে। পিকু এখন ওই ড্রয়ারগুলো খুলবে। দেখবে ভিতরে কী রাজপাট আছে।

পুরনো মানুষদের মধ্যে এক মাত্র দিদা আর হরিকাকু ওকে একই রকম ভালবাসছে এ বার। পিকু খুব মন দিয়ে চিন্তা করে দেখেছে। ওর মনে হয়েছে, দিদা যেন আগের চেয়েও বেশি করে ওকে আঁকড়ে ধরেছে। দিদাকে দেখে পিকুর তো আর কোচি ফিরতেও ইচ্ছে করছে না। যদি ফিরতে হয়ও, তা হলেও খুবই মন খারাপ করবে।

"তুমি সেই থেকে এখানেই বসে আছ? আমি বাজার যাওয়ার সময়েও দেখলাম, এখনও?"

হরিকাকা সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। তার দু'হাতে দুটো ভর্তি ব্যাগ। তা থেকে তরিতরকারি, সব্জি উঁকি মারছে।

"দিদা কোথায় গো, হরিকাকা?"

"কোথায় আবার? এ সময় কি বাইরে বেরোতে আছে নাকি? দেখো গে, ওঁর ঘরেই আছেন। কিছু আগে তো তোমায় খুঁজছিলেন," চলে যায় হরিকাকা ব্যস্ত হয়ে। আর মাত্র তিন দিন বাদেই দাদুর কাজ। হরিকাকার বসার সময় নেই। পিকু পায়ে পায়ে দিদার দোতলার ঘরটায় এসে ঢোকে। দিদা চুপ করে জানলার দিকে মুখ করে বসে আছে। ওই জানলা দিয়ে অনেক দূর পর্যন্ত মাঠ আর বিশাল আকাশ দেখা যায়। বৃষ্টি এলে পিকু কত দিন এই জানলায় উঠে বাইরে বের করে দিত ছোট ছোট হাত। বৃষ্টি ছুঁতে চাইত ও। আর দিদা টেনে টেনে ওকে বিছানার উপর এনে ফেলত। এক পলক সেই ছবিটা মনে ভেসে যায়। এত দিন কোচিতে গিয়েছে, এখানকার কথা মনেও পড়েছে। কিন্তু প্রতি মুহূর্তের এই সব ছবি এ ভাবে মনে আসেনি। এ বার আসার পর থেকেই সব মনে পড়ছে ওর।

"কী গো দিদা, তুমি ডেকেছ আমায়?"

"হ্যাঁ দাদুভাই, এক বার আমায় নীচে

তোমার দাদুর বসার ঘরটায় নিয়ে চলো। এরা তো কেউ শুনল না আমার কথা!"

এরা মানে কারা? কী কথা শুনল না তারা? পিকুর মনে প্রশ্ন জাগে। কিন্তু কিছুই না বলে, সে হাত ধরে ধরে দিদাকে নামায় খাট থেকে। তার পর এক পা এক পা করে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নিয়ে আসে।

"কী করবে দিদা তুমি নীচে? কিছু লাগলে আমাকে বলো, তোমার পায়ের ব্যথা তো বেড়ে যাবে..." নামতে নামতেই বলছিল ও।

দিদা মাথা নাড়ে, "না দাদুভাই, এটা আমারই কাজ। আমাকে যা যা বলে গেছেন তোমার দাদু, তাতে একটুও গাফিলতি হলে তো চলবে না।"

পিকু দিদার কথা থেকে কাজের কোনওই হদিস পায় না। যখন ওরা নেমেই এসেছে ঘরের সামনে, পলুমামা কোথা থেকে হন্তদন্ত হয়ে এসে দিদার সামনে দাঁড়ায়। খুব বিশ্রী ভাবে আঙুল তুলে বলে, "শুনবে না আমার কথা, তা-ই তো? নিজের ছেলের চেয়ে তোমার নাতি বড় হল? আমিও দেখব কে তোমার কত খোঁজ রাখে।"

"অকারণ অশান্তি করিস না পলু। সামনে থেকে সরে যা," দিদাও সমান তেজে আঙুল তুলে ধমক দেয় পলুমামাকে। পিকু এটা বোঝে যে ওর সম্বন্ধেই কোনও একটা কথা হল, কিন্তু কী কথা, সেটা ওর মাথায় ঢোকে না। এ বার এসে থেকেই ও পলুমামাকে দেখছে, সারা ক্ষণ রেগে থাকতে। আগে এ রকম দেখেনি কখনও। ওকে কত কোলে নিত, সাইকেলে চাপাত। পলুমামা কী করে এত পাল্টে গেল!

পিকু শক্ত করে ধরেছিল দিদাকে। ছেলের সঙ্গে রাগ করে দিদার রোগা-পাতলা শরীরটা কেঁপে কেঁপে উঠছে, "আমাকে ওই ঘরটার ভিতরে নিয়ে গিয়ে দাদুর চেয়ারের পাশে বসিয়ে দাও দাদুভাই।"

পিকু চুপচাপ ঘরটা খুলে দিদাকে বসায়।

বেশ কিছু দিন এই ঘর খোলা হয়নি। দাদু প্রায় দু'মাস শয্যাশায়ী ছিল। সেই সময় থেকেই বোধ হয়। কেমন ভ্যাপসা গন্ধ ভিতরে। দিদার কথা মতো পিকু সব জানলা একে একে খুলে দেয়। তার পর টেবিলের পাশে ছোট্ট তাকে রাখা ধূপদানিতে জ্বেলে দেয় ধূপ। আ-আ-আহ... এত ক্ষণে সেই অনেক আগের মতো লাগছে! শুধু দাদুই নেই। দাদুর বদলে দিদা। পিকু জোরে শ্বাস নেয়। হরিকাকা দিদাকে খুঁজতে খুঁজতে এই ঘরে এসে দাঁড়িয়েছে। ঘরে ঢুকে একদম চুপ হয়ে গেছে। পিকু আস্তে আস্তে পকেট থেকে চাবির গোছাটা বের করে দিদার সামনে টেবিলের উপর রাখে।

"ওটা তো তোমার দাদুভাই, তোমার কাছেই থাকবে এখন থেকে।"

"হরিকাকার কিছু দরকার। কী বলতে এসেছ তুমি হরিকাকা? দাঁড়াও, দিদা এখুনি ওই ড্রয়ার খুলে তোমার দরকার মিটিয়ে দেবে, ঠিক দাদুর মতো করে।"

"না দাদুভাই, আমি খুলব না, তুমি ওই দ্বিতীয় ড্রয়ারটা খোলো দেখি। ওটাই তোমার দাদু শেষ দিন অবধি বলছিল বার বার।"

পিকু পায়ে পায়ে এগিয়ে যায় ড্রয়ারের কাছে। চাবির গোছাটার মধ্যে নানা রকম চাবি। ও জানে না কোনটা দিয়ে খুলবে ড্রয়ার। হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করে। চাবিতে চাবিতে ঠোকা লেগে শব্দ ওঠে ঠুং ঠাং। যত সেই শব্দ ওর কানে ঢোকে, তত যেন দাদুর অনেক অনেক দিন আগে বলা কথাগুলো স্পষ্ট হয়ে আবারও বেজে ওঠে এই ঘরের হাওয়ায়...

"বলো না দাদু, কী আছে ওই ড্রয়ারগুলোয়? আমি দেখব, আমাকেও দেখতে দাও না ..."

"দেখবে বইকি দাদুভাই, তুমি ছাড়া আর কেউ নেই আমার, যে এই সম্পত্তি আগলে রাখবে। তোমাকেই দিয়ে যাব আমার রাজত্ব।"

"আঃ, বলছি তো আমার রাজত্ব চাই না। কী আছে ভিতরে বলো না! শুধু ওই চাবির গোছাটা চাই।"

"ভিতরে যা যা আছে, সব তুমি নেবে তো?"

"হ্যাঁ, নেব, নেব।"

"আছে সততা, আছে দায়িত্বজ্ঞান, আছে নির্লোভ মন, আছে বিশ্বাস, আছে ভালবাসা।"

দাদু একে একে বলে যেত একটা একটা করে চাবি গুনে গুনে, আর পাঁচ বছরের পিকুও আঙুল গুনে গুনে বলে যেত, "নেব, নেব, নেব।"

তখন বোঝেনি সে। এখন তেরো বছরের মস্তিষ্ক অনেকটাই বুঝে নেয়। চাবির গোছা হাতে নিয়ে দিদার কোলে মুখ গোঁজে পিকু। বহু দিন পর এখানে এসে থেকে আড়ষ্ট হয়ে ছিল। দাদু চলে যাওয়ার আঘাতটাও সে ভাবে প্রকাশ করতে পারেনি। এখন দাদুর ঘরে এসে, চাবির গোছাটা হাতে নিয়ে কী যে হয়ে যায়, অঝোরে কাঁদতে শুরু করে পিকু। দিদা শান্ত ভাবে বসে বসে ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়। তার পর বলে, "কান্না কেন দাদুভাই? তোমার দাদু তোমায় তো রাজত্ব দিয়ে গেছে। খুলে দেখে নাও সব দলিলপত্র, কাগজ যা কিছু আছে। আমায় ছুটি দাও।"

"আমি রাজত্ব পেয়ে গেছি দিদা। ওই ড্রয়ারে যা আছে, তা দাদু নিজেই আমাকে দিয়ে গেছেন অনেক আগে। এ বার এই চাবির গোছা তোমার কাছেই থাকবে। তুমি, পলুমামা, মিনুমাসি সবাই মিলে দেখে রেখো এই চাবির গোছাটা। আমি শুধু তোমাদের সবাইকে এক সঙ্গে চাই। যখনই আসব ... পলুমামাকে বোলো, আমার উপর যেন রাগ না করে। আর তুমিও রাগ করে থেকো না পলুমামার উপর।"

দিদাকে আবার উপরে নিয়ে যাওয়ার জন্য ঘরের বাইরে আসে পিকু। দরজার পাল্লা দুটো ভেজিয়ে দেওয়ার আগে এক বার তাকায় দেওয়ালে টাঙানো দাদুর ছবিটার দিকে। দাদু ঠিক সেই আগের মতোই পিকুর দিকে তাকিয়ে হাসছিল। পিকু সিঁড়ি উঠতে উঠতে উঠতেও শুনতে পায় দাদু ডাকছে, 'দাদুভাই, চাবির গোছাটা তোমাকেই দিয়ে গেলাম। ওইখানে রইল তোমার রাজত্ব।'

দিদাকে বিছানার উপর যত্ন করে বসিয়ে চলে আসছিল পিকু। দিদা চোখে আঁচল চাপা দিয়ে বলে, "ওইখানে সব জমিজমার কাগজ, টাকাপয়সা ছিল তোমার নামে। তুমি তো কিছুই নিলে না দাদুভাই। আমার যে ছুটি হল না।"

দিদার গলা জড়িয়ে পিকু বলে, "নিয়েছি দিদা। যা আমার নেওয়ার কথা সেই আসল জিনিস, সব নিয়েছি। দাদু ঠিক জানতেই পারবে। আমার চাবির গোছাটা তোমার কাছেই রাখা থাক। আমি আর-একটু বড় হয়ে নিই, তার পর একাই চলে আসব তোমার কাছে।"

দিদা পিকুর হাত ধরে কাছে টেনে এনে ফিসফিস করে, "তোমার নতুন মাকেও এক বার আমার কাছে নিয়ে এসো দাদুভাই। সে-ও তো আমার এক জন মেয়ে। সে আমার দাদুভাইকে ভালবাসতে পারছে আর আমি তাকে ভালবাসতে পারব না?"

পিকুর মনে হয় দাদুর দেওয়া রাজত্বের ভাগ এত দিনে দিদাও একটু পেয়ে গেল।

ছবি: বৈশালী সরকার

অনেকের ছবি আঁকতে ভাল লাগে। অনেকের ভাল লাগে গল্প, কবিতা, ছড়া লিখতে। তোমাদের যা ইচ্ছে তা লিখে এবং এঁকে পাঠাও। ভাল হলে এই বিভাগে প্রকাশ করা হবে।

আমার ছবি

উত্তরা মণ্ডল
পঞ্চম শ্রেণি, দমদম বৈদ্যনাথ ইনস্টিটিউশন ফর গার্লস, কলকাতা।

আমার লেখা

ভূতের বদলা

আমি একটা ভূত। অনেক বছর আগে যখন পাকিস্তান আর ভারতের মধ্যে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হচ্ছিল, তখন আমি পাকিস্তানের এক সৈন্য ছিলাম। ভারতের এক সৈন্যের হাতে গুলি খেয়ে আমি মরে যাই। তার পর আমি ভূত হয়ে যাই। তখন থেকেই আমার ইচ্ছে যে, আমি ভারতের উপর বদলা নেব। যে গ্রামে আমার বাড়ি ছিল, আমি এক দিন সেই গ্রামে ঘুরতে গেলাম। সেখানে গিয়ে দেখলাম, আমার বাড়িঘর ভেঙে গেছে। আমার বৌ, ছেলে কাঁদছে আমার জন্যে। দেখে আমারও খুব কান্না পেল। তখন আমি ভারতে চললাম বদলা নিতে। কিন্তু সেখানে গিয়ে দেখলাম, ভারতের যে সৈন্য আমাকে মেরেছিল, সে-ও যুদ্ধে মারা গেছে। তার ছেলে, বৌ তার জন্যে কাঁদছে। তখন আমি বুঝলাম, যুদ্ধ করা ঠিক নয়। যুদ্ধে সকলের ক্ষতি হয়। তখন আমি গোটা পৃথিবীতে যেখানে যত সৈন্য মারা পড়েছে, তাদের ভূতেদের সঙ্গে আলাপ করে, একটা বিশাল ভূতেদের আর্মি বানিয়েছি। যারা যুদ্ধ করবে, আমরা তাদের ঘাড় মটকে দেব।

সৌহার্দ্য নস্কর
তৃতীয় শ্রেণি, পাঠভবন, কলকাতা।

আমার ছবি

তৃষা দাস
সপ্তম শ্রেণি, রাজকুমারী সান্ত্বনাময়ী গার্লস হাই স্কুল, তমলুক, পূর্ব মেদিনীপুর।

তোমরা যারা দ্বিতীয় থেকে অষ্টম শ্রেণিতে পড়ো, তারা এই পাতার জন্য লেখা এবং ছবি পাঠাও, anandamelamagazine@gmail.com ঠিকানায়।

চ্যাটার্জি নোবেল স্কুল

বীরনগরের এই স্কুল লেখাপড়ার সঙ্গে খেলাধুলোকেও পাখির চোখ করে এগিয়ে চলেছে ভবিষ্যতের দিকে।

বীরনগরের এই স্কুলটির চার পাশে সবুজের সমারোহ। এলাকায় প্রথম সিবিএসই অনুমোদিত স্কুলটির বয়স কিন্তু খুব বেশি নয়। প্রতিম চট্টোপাধ্যায় স্কুলের ডিরেক্টর। তাঁর ঠাকুরদা পঙ্কজকুমার চট্টোপাধ্যায় বীরনগরে গার্লস ও বয়েজ় স্কুলের সেক্রেটারি ছিলেন। তাঁর বাবাও ছিলেন এলাকার বয়েজ় স্কুলের সেক্রেটারি। ফলে তাঁরা শিক্ষা বিভাগের সঙ্গে যুক্ত পারিবারিক ভাবেই। ২০১৬-য় প্রতিষ্ঠিত হয়। ২০২১ সালে অনুমোদন মেলে। বারো তেরো জন ছাত্র নিয়ে স্কুলের পথ চলা শুরু। তখন নাম ছিল চ্যাটার্জি ন্যাশনাল স্কুল। কিছু সরকারি কারণে ন্যাশনাল থেকে নোবেল স্কুল নামকরণ হয়। বীরনগরের জনসংখ্যা প্রায় তিরিশ হাজার। বাদকুল্লা, তাহেরপুর, ফুলিয়া, রানাঘাট, কৃষ্ণনগর, বগুলা, আড়ংঘাটা থেকে স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা আসে। এটি সহ-শিক্ষার স্কুল। যেহেতু এখনও চার দিকে মেয়েদের পড়াশোনায় খুব একটা উৎসাহ দেওয়া হয় না, সে কারণে বিশেষ যত্নে দেখা হয় মেয়েদের লেখাপড়া। গত বছর 'বেটিয়োঁ কি শিক্ষা' বলে একটা স্কলারশিপ চালু করা হয়েছিল। সেটি হল, কোনও মেয়ে যদি স্কুলে ভর্তি হয়, তাকে কোনও অ্যাডমিশন ফি দিতে হবে না। পনেরো দিনের মধ্যে সেই স্কলারশিপের তালিকায় পঁয়ষট্টি জন মেয়ের নাম অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। এখন স্কুলে পড়ুয়ার সংখ্যা ৪২০। তার মধ্যে ছেলেমেয়ের অনুপাত ৬০:৪০। প্রথমে মেয়েদের সংখ্যা আরও অনেকটাই কম ছিল। ক্রমে এই অনুপাতে মেয়েরা অনেকটাই এগিয়েছে। আরও এগোবে, আশা রাখা যায়। শিক্ষক শিক্ষিকা আছেন ৩২-৩৩ জন। স্কুলের প্রিন্সিপালের নাম ড. গুঞ্জা দাস। প্রধান শিক্ষিকা নীলাঞ্জনা চক্রবর্তী। স্কুলের বিজ্ঞান বিভাগ খুব ভাল। অনেক ল্যাবরেটরি আছে। কম্পিউটার, সোশ্যাল সায়েন্স, ম্যাথমেটিক্স, ফিজ়িক্স, কেমিস্ট্রি, বায়োলজি ল্যাব আছে। ভবিষ্যতে হোম সায়েন্সের ল্যাবরেটরি করারও পরিকল্পনা রয়েছে।

প্রতিম চট্টোপাধ্যায়

২০২৪ সালে প্রথম বার স্কুল থেকে দশম শ্রেণির ব্যাচ বেরোবে। বীরনগর বা আশপাশের অঞ্চলে এর আগে অন্য কোনও স্কুল স্বাধীনতার পর থেকে সিবিএসই বা আইসিএসই-র অনুমোদন পায়নি। কাছাকাছি অঞ্চলে সিবিএসই অনুমোদিত স্কুল করতে পারার জন্য কর্তৃপক্ষ খুব গর্বিত, তা বোঝা গেল। স্কুলে খেলা ও পড়াশোনার একটি ভারসাম্য তৈরি করার চেষ্টা করা হয়েছে। ভুবনেশ্বরে সিবিএসই-র জাতীয় স্তরে খেলতে যাচ্ছে এখানকার পড়ুয়ারা। প্রণিত রায় নামে এক ছাত্র শুটিংয়ে যোগ দিতে যাচ্ছে। স্কেটিং, আর্চারি বা তিরন্দাজি, ক্রিকেট, ফুটবল, খো খো শেখানো হয় স্কুলে। মেয়েদের জন্য বাস্কেট বল শেখানোর ব্যবস্থা আছে। এ ছাড়া সাঁতার শেখানোর কথা চলছে। ভবিষ্যতে স্কুলে সুইমিং পুল তৈরি করারও পরিকল্পনা আছে। সিবিএসই-র পাঠক্রম অনুযায়ী প্রতিটি ক্লাসরুম ডিজিটাল। সরকারি উদ্যোগে 'সফল' নামে একটি পরীক্ষা হওয়ার কথা চলছে। তার জন্য হাই-টেক কম্পিউটার ল্যাব প্রয়োজন। এই প্রয়াসে ক্লাস থ্রি-তে পড়ুয়ারা অনলাইন পরীক্ষা দেবে। তার পর ফাইভ ও এইটে উঠলে দেবে। তার পর আবার দেবে ক্লাস টুয়েলভে। এই প্রযুক্তিগত পরিকাঠামো স্কুল এ বছর করতে পেরেছে। তাই পরীক্ষাটি হবে। স্কুলে চারটি হাউস—নীল, পার্পল,

স্কুলে আছে পর্যাপ্ত পরীক্ষাগার

স্কুলে আসতে বাচ্চারা খুশিই হয়

ব্যবস্থা আছে।
এ ছাড়া স্কুলে অক্সিজেন সিলিন্ডার ও বেডের ব্যবস্থা আছে। নার্স আছে। হঠাৎ করে কোনও ছাত্র অসুস্থ হয়ে পড়লে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা যাবে। প্রচুর সবুজের মধ্যে স্কুলটি। তাই জেনারেটর ব্যবহার করা কম হয়। স্কুলের পিছনে প্রায় পাঁচশো গাছ পোঁতা হয়েছে। সবই স্কুলের পড়ুয়ারাই নিজে হাতে করেছে। ডিরেক্টর প্রতিমবাবু জানালেন, এই স্কুলটি হওয়ার ফলে মানুষের মধ্যে ইংরেজি মাধ্যমের চাহিদা তৈরি হচ্ছে। এখানে ইংরেজি প্রথম ভাষা এবং হিন্দি ও বাংলা দুটোই দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে পড়ানো হয়। প্রতিমবাবু বললেন, গ্রামীণ জায়গায় স্কুল

লাল, সবুজ। স্বামী বিবেকানন্দ, নেতাজি সুভাষচন্দ্রের নামে, মাদার টেরিজ়া প্রমুখের নামে এই হাউসগুলোর নামকরণ হয়েছে। স্কুলের লাইব্রেরিতে ২-৬ বছরের বাচ্চাদের জন্য কিডস কর্নার আছে। ই-বুক লাইব্রেরিও আছে। লাইব্রেরিতে প্রায় ২০০০-২০৫০টি বই আছে। লাইব্রেরি ডিজিটালাইজ়ড করা হয়েছে।
সিবিএসই-র স্কিল হাব প্রয়াসে স্কুলটি রেজিস্টার করেছে। এটি হল, সরকারি উদ্যোগে সরাসরি স্কুলের মাধ্যমেই হসপিটাল ম্যানেজমেন্ট, বিউটিশিয়ান কোর্স ইত্যাদি শেখানো হবে। এ বছর প্রথম নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে স্কুল ম্যাগাজ়িন বেরোবে। শিক্ষামূলক ভ্রমণের আয়োজন করে স্কুল। গত বছর পড়ুয়াদের সায়েন্স সিটি, তার আগের বছর আলিপুর চিড়িয়াখানায় নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। ক'দিন আগে সীমান্ত এলাকায় পড়ুয়াদের নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। বিএসএফ-এর সহযোগিতায় বাংলাদেশের সীমান্তে কী ভাবে সীমান্ত রক্ষা করা হয়, তার একটা নিখুঁত বিবরণ পেয়েছিল তারা। গত বছর সারা বছর ধরে প্রায় চব্বিশটি ইভেন্ট হয়েছিল। স্কুলে বার্ষিক কার্নিভ্যাল হয়—সিএনএস উইন্টার কার্নিভ্যাল। তিন দিনের এই অনুষ্ঠানে প্রথম দিন হয় স্পোর্টস। দ্বিতীয় দিনে প্রি-প্রাইমারি, প্রাইমারি বিভাগের বাচ্চাদের জন্য ম্যাজিক শো ইত্যাদি হয়। বিভিন্ন স্কুলের প্রিন্সিপালরা এখানে আসেন।
বছরে দু'বার করে পড়ুয়াদের মেডিক্যাল চেক-আপ হয়। বিভিন্ন এনজিও-র মাধ্যমে পড়ুয়ারা সমাজের জন্য নানা কাজ করে থাকে। তা ছাড়া 'নো টু প্লাস্টিক' নামে প্লাস্টিক-বিরোধী সচেতনতা ক্যাম্প, আগুন নেভানোর জন্য প্রশিক্ষণের ক্যাম্প প্রভৃতি হয়ে থাকে। করোনা নিয়েও অনেক সচেতনতামূলক ক্যাম্প হয়েছিল। যখন কোভিড এল, সেই সময় অনলাইন ক্লাস করা শুরু হয়। নতুন করে কমিউনিকেশন ক্লাস শুরু হয়, যেখানে সবাইকে কথা বলতে উৎসাহ দেওয়া হত। বাচ্চাদের মানসিক সমস্যা হয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু এক জন বাচ্চাও স্কুল ছাড়েনি। স্কুলে ছাত্রছাত্রীদের মনের বিকাশের জন্য কাউন্সিলার এবং স্পেশ্যাল এডুকেটরও আসেন। তাঁদের জন্যই বাচ্চাদের বিশেষ কোনও অসুবিধে হয়নি। উঁচু ক্লাসের বাচ্চারা স্কুলে আসতে পেরে খুব খুশি হয়েছিল।
বিশেষ ভাবে সক্ষম ছাত্রছাত্রীদের জন্য স্কুলে লিফ্ট ও আলাদা বাথরুম আছে। এগুলো সিবিএসই-র বোর্ডে এখন আবশ্যিক। স্কুলে ক্যামেরা তো আছেই। মাঠ আছে—ক্রিকেট ও ফুটবলের জন্য আলাদা ব্যবস্থা। সবচেয়ে উল্লেখ্য, স্কুলে একটি অ্যাডভেঞ্চার ক্লাব আছে। এখানে ব্যালান্সিং, রোপ ক্লাইম্বিং ইত্যাদি শেখানোর ব্যবস্থা আছে। এ ছাড়া স্কুলে যোগব্যায়াম, ক্যারাটে, নাচ, গান তো শেখানো হয়ই। ফিজ়িক্যাল এডুকেশনের ক্লাস হয়। স্কুলে শিক্ষার্থীদের আসা-যাওয়ার জন্য ন্যায্য মূল্যে বাস সার্ভিসের

রয়েছে নানা রকম খেলার সুযোগ

ক্লাসরুমে পড়ুয়ারা

চালানো খুব কঠিন। নিয়মগুলো চালু করলে তার সুফল পাওয়া যায়। বাচ্চারা এত মোবাইল-আসক্ত হয়ে যাচ্ছে, তাই পড়াশোনা ও খেলা দুটোরই উপর সমান জোর দেওয়া উচিত। বাচ্চারা ডিপ্রেশনে চলে যাচ্ছে। খেলাধুলোর মাধ্যমে মানুষ অনেক বেশি ডিসিপ্লিনড হয়। পড়বে তো বটেই, তবে মাঠে নেমে খেললে তবেই ছেলেমেয়েদের পূর্ণাঙ্গ বিকাশ সম্ভব।
নিজস্ব প্রতিনিধি

জয় হে...
DREAM11
INDIA
DREAM11
INDIA
DREAM11
INDIA
DREAM11
INDIA
16548824

আনন্দমেলা
বিশ্বকাপে ভারতের খেলা
ভারত বনাম অস্ট্রেলিয়া
৮ অক্টোবর, রবিবার, দুপুর ২টো,
এম এ চিদাম্বরম স্টেডিয়াম, চেন্নাই
ভারত বনাম আফগানিস্তান
১১ অক্টোবর, বুধবার, দুপুর ২টো,
অরুণ জেটলি স্টেডিয়াম, দিল্লি
ভারত বনাম পাকিস্তান
১৪ অক্টোবর, শনিবার, দুপুর ২টো,
নরেন্দ্র মোদী স্টেডিয়াম, আমদাবাদ
ভারত বনাম বাংলাদেশ
১৯ অক্টোবর, বৃহস্পতিবার, দুপুর ২টো,
মহারাষ্ট্র ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন স্টেডিয়াম, পুণে
ভারত বনাম নিউ জ়িল্যান্ড
২২ অক্টোবর, রবিবার, দুপুর ২টো,
হিমাচল প্রদেশ ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন
স্টেডিয়াম, ধরমশালা
ভারত বনাম ইংল্যান্ড
২৯ অক্টোবর, রবিবার, দুপুর ২টো,
ভারতরত্ন শ্রীঅটলবিহারী
বাজপেয়ী একানা ক্রিকেট
স্টেডিয়াম, লখনউ
ভারত বনাম শ্রীলঙ্কা
২ নভেম্বর, বৃহস্পতিবার, দুপুর ২টো,
ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়াম, মুম্বই
ভারত বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা
৫ নভেম্বর, রবিবার, দুপুর ২টো,
ইডেন গার্ডেন্স, কলকাতা
ভারত বনাম নেদারল্যান্ডস
১২ নভেম্বর, রবিবার, দুপুর ২টো,
এম চিন্নাস্বামী স্টেডিয়াম,
বেঙ্গালুরু
DREAM11
INDIA

খুব সাবধান

শুভমানস ঘোষ

ক'দিন ধরে বেশ গরম পড়েছে। গরম পড়লেই ঘরে ঘরে এসি চালু। তার চেয়ে চালু ইলেকট্রিসিটি। হুটহাট কারেন্ট চলে যাচ্ছে। ফোন করলেই বিদ্যুৎ দফতর থেকে মই মাথায় করে গাড়ি চলে আসছে। আলাপের বাড়ির পাশেই ট্রান্সফর্মার। দোতলার ঘরে সে থাকে। মই বেয়ে কেউ উপরে উঠলেই

জানলায় ছুটে যায়। বলে, "রোজ রোজ কারেন্ট যায় কেন কাকু?"

কাকু বলে, "যাবে না? এত এসি, লোড নিতে পারছে না।"

আলাপ বলে, "আমার ঘরে তো নেই। বাবা বলেছে কষ্ট না-করলে বড় হওয়া যায় না।"

কাকু বলে, "আমার ঘরেও নেই।"

"তুমি তো চাকরি করো। কিনতে পারো তো।"

"আমাদের পার্মানেন্ট চাকরি নয়। কিনব কী করে?" বলতে বলতে কাকু তাকায় আলাপের মোবাইল ফোনের দিকে, "এসি নেই। হাতে মোবাইল ফোন!"

আলাপ বলে, "ওটাও দিত না বাবা। কোভিডের সময় ঘরে বসে স্কুলের ক্লাস করতে হয়েছিল তো। তখন কিনে দেয়।"

কাকু ভাল করে মোবাইলের দিকে চেয়ে অবাক, "একেবারে স্মার্ট ফোন! মাথা খাওয়ার যম। তুমি আবার ছোট ছেলে।"

আলাপের মানে লাগে। বলে, "কই ছোট? সামনের বারে আমার ক্লাস টুয়েল্‌ভ।"

"সে জন্যই তো বলছি, খুব সাবধান!"

খুব সাবধান! কথাটা শুনেই হেসে ফেলে আলাপ। ছোটবেলার দুষ্টুমির কথা মনে পড়ে। তখন সে ক্লাস এইটে পড়ে। তাদের বাড়ির পাশেই জগবন্ধুজেঠুর বাড়ি। তার পাঁচ ছেলে। পাঁচ রকম ছেলে হলে যা হয়। ছোট থেকে তার ছোট ছেলে ঘোটনদা মহানন্দে বখে গিয়েছিল। লেখাপড়া ছেড়ে বিপথে চলে যাচ্ছিল। আলাপদের বাড়ি দিয়ে তার সূচনা হয়েছিল। রান্নাঘরে দুধ জ্বাল দিয়ে রেখেছিল মা। উপরে মোটা হয়ে লাল সর পড়েছে। দেখেই আর নোলা সামলাতে পারেনি ঘোটনদা। হাত দিয়ে বেশ খানিকটা সর তুলে মুখে পুরে ছুট।

মা নজর করে হাঁ হাঁ করে ছুটে গিয়ে জগবন্ধুজেঠুকে চেপে ধরেছিল। জগবন্ধুজেঠু ধরেছিল ঘোটনদাকে। দিয়েছিল রামধমক, "ওদের রান্নাঘরে ঢুকেছিলি? সর খেয়েছিস?"

ঘোটনদা ক্লাসের ফার্স্ট বয়ের মতো মুখ করে বলেছিল, "কই, না!"

"না?" ঠাস করে ঘোটনদার গালে চড় কষিয়ে জগবন্ধুজেঠু বলেছিল, "মুখে সর লেগে আছে। বলছিস, না?"

হাতেখড়িতেই ফেল। ঘোটনদা মুখ মুছতে মুছতে সেই যে পালাল ঘর থেকে, ফিরল দু'মাস পরে। তত দিনে সে বুঝেছে পরের ঘরের রান্নাঘরে হানা দেওয়ার চেয়েও আরও মহৎ কাজ আছে দুনিয়ায়। সামনেই সরস্বতী পুজো। পাড়ার কচিকাঁচা ছেলেদের জুটিয়ে লেগে গেল প্রস্তুতিতে। নতুন প্রতিদ্বন্দ্বী জুটে গিয়েছে দেখে রে-রে করে ছুটে এল পাপাইদাদা। বহু কাল ধরে পাড়ার সরস্বতী পুজোর সে একচ্ছত্র সম্রাট। লেগে গেল দু'জনে।

পাপাইদাদা বয়সে বড়। তার সঙ্গে পেরে না-উঠে এক দিন তাকে চমকাতে মাঝ রাতে ঘোটনদা পুজোর মাঠে পটকা চার্জ করে বসল। বিকট শব্দে কেঁপে উঠল পাড়া। লোকজন "কী হল? কী হল?" করে হুড়মুড় করে চোখ কচলাতে-কচলাতে বেরিয়ে এল বাইরে। কেউ বলল, 'বাজি কারখানায় বিস্ফোরণ হয়েছে।' কেউ বলল, 'উগ্রপন্থীরা হানা দিয়েছে।' কল্পনাশক্তি আর এক ধাপ তুলে এক জন তো বলেই বসল, 'ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ লেগেছে।'

মাঠের ঝোপের আড়ালে গা-ঢাকা দিয়েছিল ঘোটনদা। বেরিয়ে এল সদর্পে। বলল, "লাগুক যুদ্ধ। পুজো আমি করবই।"

লোকে বুঝে গেল এ ঘোটনদারই কাজ। সকলেই শান্তিপ্রিয় লোক। আর কথা বাড়াল না। পথে এল, "হ্যাঁ, তা-ই কর! তা-ই কর!"

ভিড়ের মধ্যে পাপাইদাদাও ছিল। ফোঁস করে উঠল, "তার মানে?"

সকলে কোমর বেঁধে লাগল পাপাইদাদাকে বোঝাতে। শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান বলে একটা কথা আছে। ঘোটন তো চুরি-ডাকাতি করতে যাচ্ছে না। পুজো করতে চাইছে। করুক না!

"তার মানে?" একই প্রশ্নে পাপাইদাদা অচল-অটল।

"মানে? এত বড় মাঠ। এক দিকে তুই কর। অন্য দিকে ঘোটন। ব্যস, ল্যাঠা চুকে গেল। সকালে তোদের ভোগ খাব। রাতে ঘোটনের। তা হলে ক'দিন বাড়িতে আর রান্নাবান্না করতে হবে না। জয় মা সরস্বতী!"

সিনিয়রদের চাপে পাপাইদাদা মেনে নিলেও রাগে গজ গজ করতে থাকল। ঘোটনদা শুধু একটা নিরীহ পটকা দিয়ে তার বাড়া ভাতে ছাই ফেলবে, ভাবেনি। সে-ও ভিতরে ভিতরে প্রস্তুত হতে থাকল। নাকের বদলে নাক। চোখের বদলে চোখ। দলবল নিয়ে প্যান্ডেল বাঁধার তদারক করছিল ঘোটনদা, তাকে দেখিয়ে এক ঝুড়ি পটকা নিয়ে পাপাইদাদা তার সাঙ্গোপাঙ্গদের নিয়ে শিস দিতে দিতে চলে গেল তাদের প্যান্ডেলে।

"দেখলে? দেখলে?" আলাপ ফিস ফিস করে বলল ঘোটনদাকে, "এক ঝুড়ি!"

"তো?" ঘোটনদা তাচ্ছিল্য করল, "ওগুলো তো ম্যাড়মেড়ে পটকা। আমার কাছে জ্যান্ত বোম আছে।"

"বোম?"

"হ্যাঁ জয় ব্যোম!" বলে ঘোটনদা পাপাইদাদাকে শুনিয়ে চ্যাঁচাল, "বোম মেরে সব উড়িয়ে দেব।"

পটকা থেকে একেবারে বোম! আলাপ আর দাঁড়াল না। শীতটা যাই যাই করছে। তার মনে হল যেন বরফ পড়ছে। ঘরে এসে লেপ টেনে শুয়ে পড়ল।

কিন্তু পুজো নির্বিঘ্নেই মিটে গেল। এসে পড়ল ভাসানের দিন। সে দিন সকাল থেকে সাজো সাজো রব দুই প্যান্ডেলে। হাওয়ায় ভাসছে, আজ রাতে যা হওয়ার হয়ে যাবে। দু'দলে মারপিট না-হয়ে যায় না। বোমায় ক'টা লাশ পড়বে, তা নিয়ে যখন গোটা পাড়া হাতের কর গুনছে, ঠিক তখনই মাথায় বিচিত্র খেয়াল চাপল আলাপের। একটা চিরকুট টেনে তাতে খস খস করে আঁকাবাঁকা অক্ষরে 'খুব
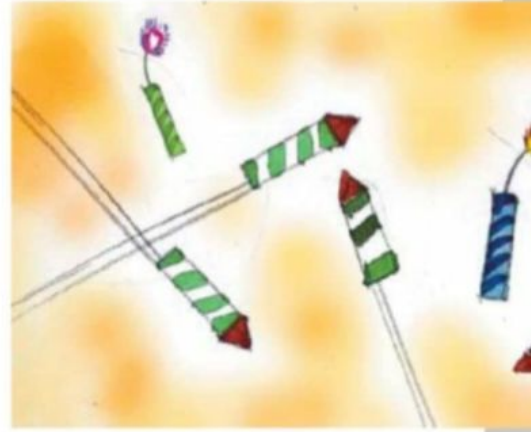
সাবধান!' লিখে জগবন্ধুজেঠুর ঘরের বিছানায় ফেলে দে দৌড়।

ব্যস, তাতেই কাজ সারা। হইহই পড়ে গেল জগবন্ধুজেঠুর বাড়িতে। ভয়ে গুটিয়ে গেল ঘোটনদাও। সে দিন ভাসান মুলতুবি রেখে ঘরে এসে শুয়ে পড়ল। ব্যান্ডপার্টি-তাসাপার্টি নিয়ে পাড়া দাপিয়ে একাই নাচতে-নাচতে পাপাইদাদা দলবল নিয়ে ভাসানে চলে গেল। পরের দিন ঘোটনদা

নমো নমো করে ঠাকুর ভাসান দিয়ে সেই যে নাক-কান মুলল, পরের বারে আর পুজোর নামই করল না।

কথাটা ভাবলে এখনও হাসি পায় আলাপের। কী দুষ্টুই না ছিল! হঠাৎ তার মনে হল, বড় হয়েছে তো কী হয়েছে? দুষ্টুমিটা আর এক বার ট্রাই করলে বেশ হয়। কিন্তু এখনকার দিনে কাগজ-কলমের চল উঠে গিয়েছে। কারেন্ট ফিরতেই পাখাটা ফুল স্পিডে দিয়ে বিছানায় শুয়ে মোবাইলটা টেনে নিল। ফেসবুকে নিজের প্রোফাইল খুলে 'হোয়াটস ইন ইয়োর মাইন্ড'-এ খুনখারাপি রঙে বড় বড় অক্ষরে সাইনবোর্ডের আকারে 'খুব সাবধান!' লিখে পোস্ট করে দিল।

সেকেন্ড ছেড়ে কয়েক মিনিটও গড়াল না। হুড়মুড় করে মেসেজের পর-মেসেজ ঢুকতে লাগল। তাতে নানা রকম জিজ্ঞাসা। নানান আইডিয়া। টক-ঝাল-মিষ্টি মন্তব্য। ফেসবুক ফ্রেন্ড লিখল, "কী হয়েছে রে আলাপ?" কেউ লিখল, "আলাপের পাগলের প্রলাপ!" কেউ বা, "কেসটা কী?" আর এক জন তো এক ধাপ বেড়ে বলে বসল, "কাকে সাবধান? কেন সাবধান? কবে থেকে সাবধান?" ফ্রেন্ডলিস্টে নেই এমন কেউ মজা করে জানতে চাইল, "রাতে কি আমার বাড়িতে আসবেন ডাকাতি করতে?"

পড়তে-পড়তে হাসি চাপতে পারছিল না আলাপ। আজেবাজে কাজে সময় নষ্ট করতে এত লোক যে মুখিয়ে থাকে কে জানত! হাসতে-হাসতেই দুপুর গড়িয়ে রাত, হঠাৎ মোবাইলটা সশব্দে বেজে উঠল। স্ক্রিনে অজানা নাম্বার। কে রে বাবা এত রাতে?

ভুরু কুঁচকে লাইন ধরে সাড়া দিল আলাপ, "হ্যালো?"

"হ্যালো না হল! কেলেঙ্কারি হল! কী ভেবেছ বলো তো!" খর খর করে উঠল এক অতি বিচ্ছিরি গলা, "কাল যাব ব্যাঙলাফানি ব্যাঙ্কে ডাকাতি করতে। এই সময় 'খুব সাবধান!' বদমাইশি হচ্ছে? কে খবর দিল তোমাকে?"

গলা কেঁপে গেল আলাপের, "আ-আপনি কে? আমার ফো-ফোন নাম্বার পে-পেলেন কী করে?"

"ফের! ফের! মেসেঞ্জারে ঘটা করে ছবি সাজিয়ে বসে মশকরা?" ধমকে উঠল বিচ্ছিরি গলা, "কে খবর দিয়েছে শিগগিরই তাকে জানিয়ে দাও, ডাকাতি ক্যান্সেল। নাক টিপলে দুধ বেরোয়। পাকা ধানে মই দিতে কী যে আনন্দ পাও!"

বলতে-বলতে ঝড়াং করে কেটে দিল ফোন। ভয়ে কাঁপতে লাগল আলাপ। যেমন তেমন নয়, খোদ ব্যাঙ্ক ডাকাত, খেপে গিয়েছে! দলবল নিয়ে এ বার তাকেই না লুঠ করতে চলে আসে! তার সম্পত্তি বলতে সবেধন নীলমণি মোবাইল ফোন। কেড়ে নিয়ে গেলে ফেসবুক, হোয়াটসঅ্যাপ, গেমিং-চ্যাটিং-রিডিংয়ের দফারফা। বাবাও ছেড়ে কথা বলবে না।

বলতে-বলতে ঝড়াং করে কেটে দিল ফোন। ভয়ে কাঁপতে লাগল আলাপ। যেমন তেমন নয়, খোদ ব্যাঙ্ক ডাকাত, খেপে গিয়েছে! দলবল নিয়ে এ বার তাকেই না লুঠ করতে চলে আসে! তার সম্পত্তি বলতে সবেধন নীলমণি মোবাইল ফোন। কেড়ে নিয়ে গেলে ফেসবুক, হোয়াটসঅ্যাপ, গেমিং-চ্যাটিং-রিডিংয়ের দফারফা। বাবাও ছেড়ে কথা বলবে না।

ভয়ে এই গরমে লেপ টেনে শুয়ে পড়বে ভাবছে আলাপ, আবার মোবাইল জ্যান্ত হয়ে গেল। দেখল এ-ও অচেনা নাম্বার। নির্ঘাত ডাকাতদাদা! লেপ পরে বের করবে ভেবে দম বন্ধ করে লাইনটা নিতেই বিশ্রী নয়, অতি সুশ্রী গলা, "চিন্তা নেই ভাইপো! আমরা সাবধানেই আছি। খবর একেবারে পাকা। কাল ব্যাঙ্ক খোলার পরই ডাকাত দল হামলা করবে ব্যাঙ্কে।"

স্বস্তির নিঃশ্বাস পড়ল আলাপের। ঠিকঠাকই আন্দাজ করল, "আপনারা কি পুলিশ? আপনি পুলিশকাকু?"

"হ্যাঁ ভাইপো। থ্যাঙ্ক ইউ!" পুলিশকাকু বলল, "ফেসবুকে তোমার পোস্টটা চোখে পড়ার পরে আর রিস্ক নিইনি। হেভি আর্মস নিয়ে আসছে জেনে ব্যাঙলাফানি ব্যাঙ্কের সামনে অলরেডি সাদা পোশাকের ফোর্স পোস্টিং করে দিয়েছি।"

কে বলে পুলিশ কাজের নয়? উৎসাহের সঙ্গে আলাপ বদমেজাজি ডাকাতের বার্তা জানিয়ে নিজের কথাও বলল। শুনে "গেল রে!" বলে দমে গেল পুলিশকাকু। তবে কৃতজ্ঞতা বলেও তো একটা ব্যাপার আছে। ডাকাত ধরে হিরো হওয়া ভেস্তে গিয়েছে দেখেও তাকে আশ্বস্ত করে পুলিশকাকু বলল চিন্তা নেই। ডাকাত তার ধারে-কাছে ঘেঁষবে না। এখনই এক মাসের জন্য তার বাড়ির বাইরে সাদা পোশাকের রক্ষী মোতায়েন করে দিচ্ছে।

যেটুকু ভয় ছিল, কেটে গেল আলাপের। লেপ নামানোর কথাই ভুলেই গেল। আনন্দে ডগমগ হয়ে নাচতে যাবে, এ বার ফোন এল ঘোটনদার কাছ থেকে। পুজো নিয়ে ঘা খেয়ে উপস্থিত কয়েক বছর ঘরেই বসে আছে। কিন্তু বাড়ির লোক শুনবে কেন? এত বড় ধাড়ি ছেলে ঘরে বসে অন্ন ধ্বংস করছে বলে দিন-রাত কথা শুনে-শুনে বোর হয়ে গিয়েছে। জানাল, এক বার ফেল করেছে তো কী হয়েছে? ভাবছে আবার পুরনো লাইনেই নতুন করে চেষ্টা করবে।

আলাপ চমকে উঠল, "কেন? কেন?"

ঘোটনদা জানাল, "ভাবছি আজ রাতে মই চুরি করব।"

আলাপ অবাক, "মই!"

"আরে বোকা দেখিসনি আজ ইলেকট্রিক কোম্পানির লোক ট্রান্সফর্মার সারাতে এসে ভুল করে মই ফেলে গিয়েছে? ওটা দিয়েই ভাবছি উদ্বোধন করব। তোর তো নাকের ডগায়। খবরদার কাউকে বলবি না।"

আলাপ বলল, "আবার শুরু করেছ এ সব! এখনও শিক্ষা হয়নি তোমার?"

"হল কই?" ঘোটনদা দীর্ঘশ্বাস ফেলল, "স্কুলে গড়াইস্যর খালি খালি গাঁট্টা মারত আর বলত, 'তোর মাথায় গোবর।' মই চুরি বাদ দেব বলছিস? গড়াইস্যরের বাড়ি যাব? দেখব কী পাই?"

"গাঁট্টা ছাড়া কিচ্ছু পাবে না। বাড়ি যাও! বাড়ি যাও।"

'কী যন্ত্রণা! বাড়িতেই তো আছি। তোর মতো একটা ফোন কেনার কত দিনের ইচ্ছে। মইটা বেচে হবে না?"

এমনি গড়াইস্যর গাঁট্টা কষাত? মই বেচে কি না স্মার্ট ফোন কিনবে! আনস্মার্ট আর কাকে বলে! "যাও!" বলে রেগেমেগে ফোন কেটে খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়ল আলাপ। চোখ জড়িয়ে এল ঘুমে। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে নিশ্চিন্তে স্বপ্ন দেখল, তার বাড়ির বাইরে কোমরে রিভলভার গুঁজে ঠায় দাঁড়িয়ে আছে স্বয়ং পুলিশকাকু। মই চুরি করতে ঘোটনদা বাড়ি থেকে বেরোতেই কঠিন চোখে তাকাল। কিন্তু কিচ্ছু বলল না।

ঘোটনদা আড় চোখে তাকে দেখে গট গট করে এগিয়ে গেল ট্রান্সফর্মারের দিকে। তাও পুলিশকাকু কিচ্ছু বলল না। ঘোটনদা মইয়ের কাছে গেল। টেনেটুনে দেখছে মই ঠিকঠাক আছে কি না, বেচলে ফোনের দাম উঠবে কি না, কিছুই বলছে না পুলিশকাকু। চেয়ে চেয়ে শুধু দেখছে।

'কে রে লোকটা? শুধু শুধু কী এত দেখছে?'— মনে মনে বলে ঘোটনদা উঠেই পড়ল মইয়ে। চেক করে দেখছে, ভাল মই? না, বাতিল মই বলে ফেলে রেখে গিয়েছে? তবু কী যে পুলিশকাকুর ভাব, কোমর থেকে রিভলভার বের করা পরের কথা, মুখের কথাও বের করছে না।

স্বপ্নের মধ্যেই খিল খিল করে হাসতে গিয়ে ভচ করে হেঁচে ফেলল আলাপ। সঙ্গে সঙ্গে ঘুমটা ভেঙে গেল তার। দেখল একটা মোটা লাঠি। ঘরে ঢুকেছিল। আস্তে আস্তে জানলার দিকে ব্যাক করে ছোট হয়ে যাচ্ছে। লাঠির আগায় লাগানো আঠায় সেঁটে আছে তার মোবাইল ফোন। জানলা দিয়ে লাঠি গলিয়ে সেটা নিয়ে পালানোর সময় তার নাকে টাচ করায় হেঁচে ফেলেছে।

"কে? কে?" বলে ধড়মড় করে উঠে বসল আলাপ।

"আমার ফোন! আমার ফোন!" বলে লাঠির আগা থেকে টান মেরে মোবাইলটা ছাড়িয়ে হাতে নিয়ে বাইরে তাকিয়েই অবাক। স্বপ্ন যে এ ভাবে মিলে যায় কে জানত! ট্রান্সফর্মারের আলোয় দেখল, সত্যিই ঘোটনদা। মই চুরির নাম করে মইয়ে উঠে তার ঘরের জানলা দিয়ে লাঠি দিয়ে তারই মোবাইল চুরি করার মতলব করেছিল। কিন্তু আবার ডুবিয়েছে, আলাপ উঠে পড়েছে দেখে জিভ কেটে উত্তেজনার বশে তাড়াহুড়ো করে জোরে লাঠি টানতেই মইটাকেও যে টেনে বসেছে, জানবে কী করে?

মই এমনিতে খুব ঠান্ডা প্রাণী। যেখানে রাখবে লক্ষ্মী ছেলের মতো থেকে যাবে। পুলিশকাকুর মতো টুঁ শব্দটি করবে না। কিন্তু ঘাঁটালেই মুশকিল। সেটাই হল। টান পড়তেই ঘোটনদাকে নিয়ে দেওয়াল ছেড়ে শূন্যে সটান খাড়া হয়ে দাঁড়াল। কোন দিকে পড়বে, ভাবতে সময় নিচ্ছে। ঠিক যেন চাঁদে ল্যান্ডার বিক্রমের ল্যান্ডিংয়ের আগের ক্রিটিক্যাল কয়েক মুহূর্ত।

"গেল! গেল! গেল!" নিজের মোবাইল আর একটু হলে বেহাত হচ্ছিল। রাগ ভুলে ভয়েই চেঁচিয়ে উঠল আলাপ, "পড়ে যাবে ঘোটনদা! পড়ে যাবে! মই পড়ছে! মই পড়ছে! খুব সাবধান!"

সাবধানবাণী দিয়ে ছোট থেকে লোকজনকে ঘায়েল করেছে আলাপ। এ বার আর কাজ হল না। মই আর দেওয়ালের দিকে ফিরেও তাকাল না। ঘোটনদাকে যত্ন করে সঙ্গে নিয়েই উল্টো দিকে রাস্তার পাশের ঝোপে মুখ থুবড়ে পড়ল।

ছবি: প্রসেনজিৎ নাথ

গল্প পাঠানোর নিয়মাবলি

▶ আনন্দমেলায় গল্প পাঠাতে হবে ডাকে কিংবা ইমেলে। পত্রিকা দফতরের রিসেপশনে এসেও গল্প জমা দিতে পারেন।

▶ ডাকে কিংবা দফতরে জমা দিলে গল্পটি হাতে লিখে কিংবা কম্পিউটারে কম্পোজ় করে প্রিন্ট আউট নিয়েও পাঠাতে পারেন। তবে লেখাটি মনোনীত হলে তখন কিন্তু ইউনিকোডে কম্পোজ় করা সফ্‌ট কপি পাঠাতে হবে। ইমেলে পাঠালে কিন্তু গল্পটিকে প্রথমেই ইউনিকোডে কম্পোজ় করেই পাঠাতে হবে।

▶ গল্পের পাণ্ডুলিপির সঙ্গে নিজের নাম, ঠিকানা, মোবাইল/ ফোন নম্বর পাঠানো বাধ্যতামূলক।

▶ গল্পের শব্দসংখ্যা ২০০০-এর মধ্যে রাখাই ভাল।

▶ গল্পটি যেন মৌলিক হয়। অন্য কোনও গল্পের অনুবাদ কিংবা অনুসরণ কিংবা অনুকরণ হলেও চলবে না। এবং কোথাও যেন গল্পটি প্রকাশিত না হয়ে থাকে।

▶ ডাকযোগে গল্প পাঠানোর ঠিকানা: সম্পাদক, আনন্দমেলা, ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০০১।

▶ গল্প পাঠানোর ইমেল হল: anandamela@abpmail.com

ডিজ়নিল্যান্ডে প্রবেশের পথে

হংকং শহরের গল্প

আপাদমস্তক আধুনিক হংকংয়ে আজও বয়ে চলেছে ঐতিহ্যের চোরা স্রোত। তার মাঝেই এক টুকরো রূপকথার রাজ্য—ডিজ়নিল্যান্ড। চমৎকার এই শহর ঘুরে লিখেছেন **অর্পণ রায়চৌধুরী**

সুবাসিত বন্দর

নীল সমুদ্রে ভেসে চলেছে কাতারে কাতারে বাণিজ্যতরী। সূর্য ডুবেছে খানিক ক্ষণ আগে। বিকেল পেরিয়ে সন্ধে নামছে ভিক্টোরিয়া হারবারে। পাতলা কুয়াশার একটা স্তর উঠে আসছে ভিক্টোরিয়া পিকের গা বেয়ে। একে একে জ্বলে উঠেছে জনবসতির আলো। হংকং-এর সারা শরীর জুড়ে এখন সোনালি আলোর চুমকি, যেন দীপাবলির রাত। টিপ টিপ করে শুরু হল বৃষ্টি, সঙ্গে জোলো হাওয়া। কর্কটক্রান্তি রেখার ঠিক দক্ষিণে হংকংয়ে গ্রীষ্মে বেজায় গরম আর বর্ষায় প্রচুর বৃষ্টিপাত, শীত প্রায় পড়েই না। পার্ল নদীর মোহনায় এ দেশটায় হংকং, গাওলং, ল্যানটাও আর নতুন রাজ্য সহ ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে মোট দুশো ছত্রিশটি দ্বীপ। হংকং নামটা এসেছে ক্যান্টোনিজ় ভাষা হাক্কা থেকে, যার মানে সুবাসিত বন্দর। পার্ল নদীর মোহনা নাকি মিষ্টি গন্ধে আমোদিত, তাই এই নাম। আজ আকাশছোঁয়া অট্টালিকায় মোড়া এই শহরে ঢুকে এর চমক আর জমক দেখে বুঝলাম, এসে পড়েছি বিশ্বের অন্যতম ধনী রাষ্ট্রে।

দ্য পিক

বিমানবন্দর থেকে হোটেলে পৌঁছে বিকেলবেলায় পিক ট্রামে চড়ে উঠে এসেছি ভিক্টোরিয়া পিকে। এই পাহাড়চূড়াকে হংকংবাসীরা বলে 'দ্য পিক', যা অতীতে সিগন্যালিংয়ের কাজে ব্যবহৃত হত। জিনিসবাহী জাহাজ এই পিকের নীচে এসে পতাকা তুললে উপর থেকে তোপধ্বনি করা হত। হংকংয়ে গ্রীষ্মকালে প্রচণ্ড গরম। অথচ উচ্চতার কারণে পাঁচশো বাহান্ন মিটার উঁচু ভিক্টোরিয়া পিকে গরম মোটেও প্রখর নয়, সেখানে পাহাড়ি আবহাওয়া। প্রচণ্ড গ্রীষ্মের দাবদাহ থেকে বাঁচতে চেয়েই ভিক্টোরিয়া পিকে বসবাসের কথা ভাবতে শুরু করেন হংকংবাসীরা। স্যর রিচার্ড ম্যাকডোলেন গভর্নর থাকাকালীন এখানে প্রথম গ্রীষ্মাবাস গড়ে তোলেন। দেখাদেখি শহরের বিত্তবানরাও একে একে বাড়ি বানাতে শুরু করেন। তাঁরা তখন দু'জন কুলিতে টানা সেডান চেয়ারে বসে ওঠানামা করতেন। কিন্তু তা ছিল ভীষণ সময়সাপেক্ষ। ও দিকে এখানে ঘরবাড়ি বেড়েই চলেছে, তাই দ্রুতগামী যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রয়োজন। সমস্যার সমাধান দিলেন আলেকজ়ান্ডার ফ্রেন্ডলি স্মিথ নামে এক স্কটিশ সাহেব। ১৮৮১ সালের মে মাসে তিনি এই পথে ফিউনিকুলার রেলের পত্তন করেন। সেই সময় ছিল কয়লা-চালিত কাঠের ট্রাম। তা-ই আজ যুগ বদলে পিক ট্রামে রূপান্তরিত হয়েছে।

চলে প্রতি দিন সকাল সাতটা থেকে রাত বারোটা। দশ মিনিট ছাড়া ছাড়া এই ট্রামের মিনিট পনেরোর যাত্রা সত্যি মনে রাখার মতো। খাড়াই পাহাড়ের গা বেয়ে এতটাই সোজা ওঠে যে, দু'পাশে উঁচু উঁচু গাছপালা, বহুতলগুলোকে মনে হয় সামনে ঝুঁকে পড়েছে। ট্রামের আপার টার্মিনাসটা কিন্তু ঠিক পাহাড়চূড়ায় নয়, ভিক্টোরিয়া গ্যাপে। আমরা হাঁটতে হাঁটতে এসেছি পিক টাওয়ারের স্কাই টেরেস ৪২৮-এ। উপর থেকে চতুর্দিকের দৃশ্য অসাধারণ। নীচে ভিক্টোরিয়া হারবারের নীল জলে রংবেরঙের বাণিজ্যতরী আর পাহাড়ি টিলায় মোড়া হংকং, গাওলংয়ের ৩৬০ ডিগ্রি প্যানারোমিক ভিউ— অ-পূ-র্ব! এই পিক টাওয়ার এখন হংকংয়ের আইকন। কী নেই এই টাওয়ারে? পিক মার্কেটের সস্তার হস্তজাত চেনা শিল্প থেকে ব্র্যান্ডেড জিনিসপত্র, চাইনিজ়, জাপানিজ়, কন্টিনেন্টাল রেস্তরাঁ, হংকংয়ের শরবত, কফি শপ থেকে সিনেমা হল, ভিডিয়ো গেমস পার্লার, আরও কত কী! আছে অরণ্য, ঝর্না, পশুপাখি-অধ্যুষিত আধুনিক এক নেচার পার্কও।

সন্ধে ঘনাতে বৃষ্টির শাসানিতে নেমে এলাম মাদাম তুসোর মিউজ়িয়ামে। খোলা থাকে সকাল দশটা থেকে রাত দশটা। এত দিন বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় পড়েছি, আজ চাক্ষুষ করলাম। আসলটা যদিও আছে লন্ডনে, তবে এখানেও মোমের প্রতিকৃতি অসাধারণ। ছ'টা থিম। এলাকা জুড়ে আছে একশোরও বেশি আন্তর্জাতিক ও স্থানীয় মডেল। ঢুকতেই জ্যাকি চ্যানের কাঁধে হাত রেখে ফটো তোলা। তার পর একে একে দেখা হল আইনস্টাইন, আইজ্যাক নিউটন, উইলিয়াম শেক্সপিয়র, হিটলার, গান্ধীজি, নেতাজি, অমিতাভ বচ্চন, সচিন তেন্ডুলকর, দলাই লামার সঙ্গে। দেখা হল বিটল্‌স-এর সঙ্গে। বাদ গেল না স্পাইডারম্যানও। আজকের সফর শেষ হবে হারবার ক্রুজ়ে ভ্রমণ সেরে। চড়ে বসলাম শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত প্রমোদতরী অ্যাকুয়ালুনা-য়। ভেসে চলেছি বিখ্যাত সেই ভিক্টোরিয়া হারবার ধরে। দু'পাশে আলো-ঝলমলে ঘর, বাড়ি, অফিস। রঙিন নিয়ন আলোর ছায়া পড়েছে জলে। ঠান্ডা বাতাস বইছে। ভিক্টোরিয়া হারবার জুড়ে রঙের হুল্লোড়। আশপাশ দিয়ে বয়ে চলেছে রংবেরঙের প্রমোদতরী আর অসংখ্য পালতোলা ইয়ট। নবাবি চালে কী ভাবে যে কেটে গেল পাক্কা এক ঘণ্টা, টেরই পেলাম না। হোটেলে ফিরে বিছানায় শরীরটা এলিয়ে দিতেই হারিয়ে গেলাম ঘুমের দেশে।

মায়াবী ডিজ়নিল্যান্ড

নৌবিহার

রূপকথার রাজ্য: ডিজ়নিল্যান্ড

আজ সারাটা দিন কাটাব ডিজ়নিল্যান্ডে। তাই ধীরে-সুস্থে বেরিয়ে বাসে চড়ে এলাম ল্যানটাও দ্বীপে। এখানেই আছে সেই ডিজ়নিল্যান্ড। রূপকথার এই রাজ্যটি হংকং ছাড়াও আছে আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়া, ফ্রান্সের প্যারিস, ও জাপানের টোকিয়োয়। ডিজ়নিল্যান্ড নামটা শুনলেই মনে পড়ে মিকি মাউসের কথা। ওয়াল্ট এলিয়াস ডিজ়নি ছিলেন মিকি মাউসের স্রষ্টা। ১৯০১ সালের ৫ ডিসেম্বর আমেরিকার শিকাগোয় জন্মালেও তিনি পরে চলে আসেন মার্সেলিন শহরের এক খামারে। ছোট্ট থেকে খুব সুন্দর ছবি আঁকতেন তিনি। কিন্তু বাবা মোটেই চাইতেন না, ওয়াল্ট আর্টিস্ট হন। বাবার সঙ্গে এক রকম ঝগড়া করেই এক দিন ওয়াল্ট বাড়ি ছাড়লেন। কাজের খোঁজে বেরিয়ে এক প্রতিষ্ঠানে তিনি বিজ্ঞাপনের ছবি আঁকার কাজ পেলেন। অ্যানিমেশন নিয়ে তাঁর কাজের সেই শুরু। ইঁদুরকে তিনি ভীষণ ভয় পেতেন। এক দিন গ্যারেজে বসে ওয়াল্ট ছবি আঁকছেন, এমন সময় পায়ের উপর দিয়ে পুঁচকে একটা ইঁদুর দৌড়ে গেল।

ভিক্টোরিয়া পিক থেকে হংকং শহর

"উরিব্বাস!" বলে লাফিয়ে উঠলেন তিনি। পুঁচকে ইঁদুরটার কিন্তু কোনও ভ্রূক্ষেপ নেই। লেজ উঁচিয়ে বুক ফুলিয়ে দিব্যি গ্যারেজ জুড়ে সে ঘুরে বেড়াতে লাগল। তা-ই দেখে ডিজ়নিরও ভয় কেটে গেল। বেশ মজা পেতে লাগলেন তিনি। টুলে বসে কুঁজো হয়ে এঁকে ফেললেন সেই ছোট্ট ইঁদুরের ছবি। সেই ইঁদুরই হয়ে গেল সবার প্রিয় মিকি মাউস। শুধু কি মিকি মাউস? একে-একে তিনি সৃষ্টি করলেন সিন্ডারেলা, পিটার প্যান, অ্যালিস-এর ওয়ান্ডারল্যান্ড। সেই কার্টুন চরিত্রদের নিয়েই বিশ্বের নানা প্রান্তে তৈরি হল বাচ্চাদের স্বপ্নপুরীর ডিজ়নিল্যান্ড।

'ওয়েলকাম টু ডিজ়নিল্যান্ড' লেখা প্রবেশদ্বার দিয়ে ঢুকে পড়লাম। সত্যি বলতে কী, সম্পূর্ণ ডিজ়নিল্যান্ড ঘুরে দেখতে হলে দিন দুয়েক সময় লাগে। কিন্তু আমাদের হাতে অত সময় নেই। আগামিকালই তো হংকং ছেড়ে চলে যাব ম্যাকাও। তাই এখানকার একটা ম্যাপ জোগাড় করে নিজেরাই ছকে ফেললাম কেমন করে ঘুরব, খুব সংক্ষেপে। এখন মে মাস। যেমন রোদের তাপ তেমনি ভ্যাপসা গরম হংকংয়ে। দরদর করে ঘাম হচ্ছে। তাই শরীর জুড়োতে প্রথমে ঢুকলাম বড় বড় গাছপালা ঘেরা এক থিয়েটার হল, 'অ্যাডভেঞ্চার ল্যান্ড'-এ, 'দ্য লায়ন কিং' দেখতে। বাঘ, ভালুক, হাতি, ঘোড়া প্রভৃতি সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে পশুরাজের এক জমকালো উপস্থাপনা। এখানকার 'জাঙ্গল রিভার ক্রুজ়'টি বেশ রোমহর্ষক। ঘন অরণ্যের মাঝে টারজ়ানের কাঠের ঘরের পাশ দিয়ে ভুটভুটিতে চড়ে চলেছি। দুই তীরের গাছপালা শিকড়বাকড় সুদ্ধ হুমড়ি খেয়ে পড়েছে ঘাড়ের উপর। বাচ্চাকে সঙ্গে নিয়ে হাতি জলে দাঁড়িয়ে শুঁড় দিয়ে জল ছেটাচ্ছে। কাছে যেতে বুঝলাম সত্যি নয়, নকল হাতি, একেবারে আসলের মতো! আর-একটু গিয়ে পিলে চমকে দেওয়া জলোচ্ছ্বাস। ঘন জঙ্গল থেকে বিকট আওয়াজ করে ভূত-প্রেত-কঙ্কালের হানা! সে এক গায়ে কাঁটা দেওয়া অভিজ্ঞতা। শেষে ভীষণ শব্দে অগ্নিবর্ষণ। লর্ড হেনরির 'মিস্টিক পয়েন্ট'-এ ম্যাগনেটিক ইলেকট্রিক ক্যারেজে চড়ে তাঁর শিল্পকলা দেখা আর-এক অভিজ্ঞতা। 'টয় স্টোরি ল্যান্ড'-এ ভিড় করেছে কচিকাঁচার দল। সেখানে আছে উচ্চ গতি সম্পন্ন 'ইউ' আকৃতির কোস্টারে সাতাশ মিটার উঁচুতে তুলে প্যারাসুট পরিয়ে পুতুল জাম্পারদের সঙ্গে লাফ দেওয়ার ব্যবস্থা!

ঘুরতে ঘুরতে দুপুর হয়েছে, খিদে পেয়েছে বেশ। আমাদের প্রবেশমূল্যের মধ্যেই মধ্যাহ্নভোজের দাম ধরা। তবে নির্দিষ্ট আছে ছ'টি রেস্তরাঁ। খেতে হবে সেগুলোরই মধ্যে কোনও একটায়, যা মন চায়। গোটা ডিজ়নিল্যান্ড জুড়ে আছে চাইনিজ়, জাপানিজ়, কন্টিনেন্টাল, ওয়েস্টার্ন ফুডের রেস্তরাঁ। আমাদের পছন্দ চাইনিজ় কুইজ়িন। স্মোকড স্যামন স্যান্ডউইচ, জ্যাকেট পটেটো উইথ সালসা, আর এক ক্যান করে কোল্ড ড্রিঙ্ক খেয়ে বেশ নতুনত্বের স্বাদ পেলাম। মধ্যাহ্নভোজ সেরে এলাম ফ্যান্টাসি ল্যান্ড-এর বাগানে। মিকি ও তার বন্ধুদের সঙ্গে ছোট্ট একটা ফটোসেশন সেরে 'স্টোরিবুক থিয়েটার'-এ ঘণ্টা খানেক কাটল নাচে-গানে ভরা ডিজ়নি শো দেখে। বেরিয়েই দেখি ভিড় জমেছে মেন স্ট্রিট ইউএসএ-তে।

শুরু হয়েছে ফ্যান্টাসি প্যারেড। মিকি ও ডিজ়নির চরিত্রদের সে এক চোখ ঝলসানো অবাক করা প্যারেড। এমন বর্ণময় প্যারেড দেখে বেবাক হাঁ হয়ে গেলাম। বিকেল শেষে এলাম ‘টুমরো ল্যান্ড’-এ। চাপব কি চাপব না, দোনামনা করে শেষ পর্যন্ত চড়েই বসলাম স্পেস মাউন্টেনে। ‘দুর্বল চিত্তের ব্যক্তিদের জন্য নয়’, বসার ঠিক আগে এমন বিজ্ঞপ্তি দেখে বুকটা যে কেঁপে ওঠেনি, তা নয়। তবু লজ্জার খাতিরে বসেই পড়লাম ‘ইন্টারস্টেলার রোলার কোস্টার’-এ। ছোট্ট গাড়িতে পাশাপাশি দু’জন, কোমরে বেল্ট, পায়ে লক। দু’হাত দিয়ে সামনের হাতল যতটা পারি আঁকড়ে ধরেছি গায়ের জোরে। কাউন্টডাউনের পরেই ভীষণ গতিতে হারিয়ে গেলাম মহাশূন্যের অন্ধকারে। মাথার উপরে শুধুই তারা, আর কিছুই চোখে পড়ছে না। প্রবল বেগে কখনও উঠছি, কখনও নামছি। কখনও ডাইনে তো পর ক্ষণেই বাঁয়ে বাঁক। এই বুঝি ছিটকে বেরিয়ে গেল পিতৃদত্ত সাধের প্রাণটা! ঠিক যখন খাঁচা ছেড়ে সে উড়বে উড়বে করছে, ঠিক তখনই থামল সেই বেয়াদব কোস্টার। ধড়ে প্রাণ ফিরে পেলাম। ঘেমেনেয়ে একসা! ইষ্টনাম জপ করতে করতে খানিক ক্ষণ বসলাম বাইরে।

শুনলাম এর চেয়েও ভয়ঙ্কর এক কোস্টার আছে এখানেই। এর পরেও তাতে চাপা তো দূর অস্ত, দেখতে যাওয়ার অবধি সাহস হল না। এখানে ডিজ়নি পার্কের কাছেই আছে দুটো থিম হোটেল। সেখানকার ইন্টারন্যাশনাল মিকি স্টাইল বুফেতে খাওয়ার ফাঁকে দিব্যি আড্ডা মারা যায়, স্টার শেফ মিকির সঙ্গে। ধীরে ধীরে সন্ধে পা রাখছে ডিজ়নিল্যান্ডের আশ্চর্য জগতে। একে একে জ্বলে উঠছে রেস্তরাঁ, সুভেনির শপ, থিয়েটার পার্কের আলো। চার দিকে নানা আকারের ঘর-বাড়ি ফুলের বাগান দিয়ে সাজানো। তার কোনওটা সিনেমা হল, কোনওটা মিউজ়িয়াম, কোনওটা সুভেনির শপ, কোনওটা আবার অ্যানিমেশন রুম। রাস্তায় রাস্তায় সাবেক আমলের

বিটল্‌স গানের দলের অবিশ্বাস্য মোমের মূর্তি

স্পাইডার-ম্যান

আলো জ্বলছে। মোড়ে মোড়ে ঝাঁকে ঝাঁকে বেলুন বিক্রি হচ্ছে। রাত ঠিক সাড়ে আটটায় শুরু হল এখানকার সবচেয়ে চিত্তাকর্ষক প্রদর্শনী, ‘ডিজ়নি ইন স্টার্স ফায়ারওয়ার্কস’। কত রকমের আতশবাজি আর কত রকমের যে রং, তা ভাষায় প্রকাশ করা এই কলমচির সাধ্য নয়। এ যেন সুরের ছন্দে, লয়ে রঙের উৎসব। রাতের অন্ধকার আকাশ আলোয় আলো। সঙ্গে স্পেশ্যাল এফেক্ট। আলো ও ধ্বনির সাহায্যে ডিজ়নি ফিল্মের এক অসাধারণ উপস্থাপনা। স্তম্ভিত করা বর্ণময় এই অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা হল রাত ঠিক ন’টায়। সঙ্গে সঙ্গে সে দিনের মতো বন্ধ হল ডিজ়নিল্যান্ড। ফিরে চললাম হোটেলে। হংকংয়ে আজই আমাদের শেষ রাত। টেম্পল স্ট্রিটের নাইট মার্কেটে এক বার ঢুঁ মেরে ঢুকে পড়লাম হোটেলে।

আজ রাতে এলাহি খানাপিনার ব্যবস্থা। চেখে দেখলাম এখানকার বিখ্যাত মাংস, ‘সিউনর’। খাওয়া শেষে এসে বসলাম ঘরের লাগোয়া বারান্দায়। আমাদের হোটেলটি সমুদ্রের ধারে, বন্দর এলাকায়। এখানে নোঙর করেছে দলে দলে বাণিজ্যতরী। এক ফালি চাঁদ, তারাদের সঙ্গে জেগে আছে আকাশ। শহর জুড়ে লেগেছে ঘুমের ঘোর। নিশি-শেষে
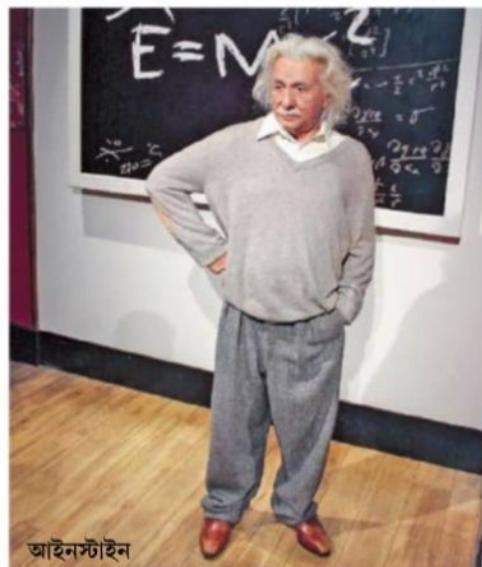
আইনস্টাইন

আমাদের নোঙর তোলার পালা। ১৮৬০ সাল থেকে প্রতি দিন দুপুরে ভিক্টোরিয়া পিকে যে তোপধ্বনি দেওয়া হত, আজ তা বন্ধ হয়েছে। ডাকটিকিটে আর দেখা যায় না রানির মুখ। টেলিভিশনেও আর বাজে না ‘গড সেভ দ্য কুইন’। তবু ব্রিটিশ শিষ্টাচার যেন মিশে গেছে হংকংবাসীদের আদব কায়দায়। রাস্তায় দেখা হলে তারা এক গাল হেসে জেনে নেন কুশল সংবাদ, ‘‘নেই হাত্তাম?’’ মানে, ‘আপনি কেমন আছেন?’

কেনেডি টাউন থেকে এখনও ছাড়ে ট্রলি ট্রাম। গাওলং পার্কে গেলে এখনও দেখা যায় প্রবীণরা আইচ প্র্যাকটিস করছে। আধুনিকতায় আষ্টেপৃষ্ঠে মোড়া এ দেশে আজও বয়ে চলেছে ঐতিহ্যের চোরা স্রোত।

ফটো: লেখক

জন্মদিনে বিভ্রাট

সিজার বাগচী

ত্রিপলটা দেখে শুধু অনি নয়, বাবাও থমকালেন। ডেকরেটর প্রশান্তবাবুর মুখে চওড়া হাসি। বললেন, "দেখছেন কেমন জিনিস!"

"দেখছি তো বটেই। এটা ত্রিপল না সার্কাসের তাঁবু!" বাবা বললেন।

প্রশান্তবাবু হেসে বললেন, "এই এলাকায়

যত হরিনাম সংকীর্তন হয়, সব জায়গায় এটার দরকার পড়ে!"

"ত্রিপল দিয়ে হরিনাম সংকীর্তন হয়," অনি অবাক হয়ে বলল।

"আহ, ত্রিপল দিয়ে কেন হবে? গরম কাল হলে এই ত্রিপল গোটা মাঠ জুড়ে পাতা হয়। শীত কাল হলে মাথার উপর ছাউনি..."

প্রশান্তবাবু বিশ্লেষণ করতে করতে নিজের লোকজনদের নির্দেশ দিলেন। তারা ত্রিপলটাকে ভাঁজ করে ছাদের উপর টাঙাতে লাগল। অনি আশ্চর্য হয়ে দেখল, তাদের অমন ফুটবল মাঠের মতো ছাদের পুরোটার উপর ছাউনি করা গেল ওই ত্রিপল দিয়ে।

বাবা তত ক্ষণে ছাদের অন্য প্রান্তে চলে গিয়েছেন। সেখানে তখন বিরিয়ানি রান্নার তোড়জোড় চলছে। বাবা ফোনে কারও সঙ্গে কথা বলছেন আইসক্রিম, কেক, আম-পোড়ার শরবত নিয়ে। দু'-তিন দিন ধরেই গুমোট গরম পড়েছে। তাই বাবা ঠিক করেছেন, সবাইকে আগে আম-পোড়ার শরবত দিয়ে আপ্যায়ন করবেন। তার পর অন্য আয়োজন।

অনি তড়বড় করে হাঁটতে হাঁটতে এই সব দেখতে লাগল। আজ আট-ই এপ্রিল। আজ ওর জন্মদিন। অনি আজ দশ বছরে পড়ল। প্রতি বছরই অনির জন্মদিনে বাড়িতে অনুষ্ঠান হয়। মা পায়েস করেন। সন্ধেবেলা কাছের বন্ধু আর পাড়ার কয়েক জনকে ডেকে কেক কাটা হয়। রাতে ভাল রান্না হয়। সেই সব মা-ই করেন। সবাই মিলে খাওয়াদাওয়া হয়। আর প্রতি বারই নানা রকম গিফ্‌ট পায় অনি।

কিন্তু এ বারের ব্যাপার আলাদা। গত বছর জন্মদিনের পরই ঠাকুরমা বলেছিলেন, "দাদুভাই, সামনের বার তুমি দশ বছরে পড়বে। সে দিন আরও বড় করে জন্মদিন করব। সে দিন আর ঘরোয়া জন্মদিন হবে না। ডেকরেটরকে দিয়ে ছাদে প্যান্ডেল করে কেক কাটা হবে। আলাদা করে রান্না করানো হবে। সবাই আসবে। বেশ বড় করে অনুষ্ঠান হবে।"

আজ সেই অনুষ্ঠান। সকাল থেকে বাড়িতে সাজো সাজো ব্যাপার। রান্নার সরঞ্জাম, জিনিসপত্র, ডেকরেটরের বাঁশ, চেয়ার-টেবিল সব আসতে শুরু করেছে। দুপুরের মধ্যে সেই সব চেয়ার-টেবিল পাতাও হয়ে গিয়েছে ছাদে। আলোও লাগানো হয়েছে। এ বার বেলুন ফোলানো হচ্ছে। বাকি ছিল শুধু ত্রিপলের চাঁদোয়া। সেটাও করা হল। ছাদে কয়েকটা আলোও লাগানো। সেটা বাবা করেছেন।

এখন সন্ধে প্রায় হয়-হয়। বাবা ঠিক করেছেন সন্ধে ছ'টা নাগাদ কেক কাটবেন। তার পর খাওয়াদাওয়া সাতটা-আটটা থেকে শুরু করে দেবেন। অনির স্কুলের কয়েক জন বন্ধু একটু দূর থেকে আসবে। তাদের বাড়ি ফেরার কথাও মাথায় রাখতে হবে।

অনিকে আজ কেউ বকেনি। পড়তে বলেনি। কোনও কিছুতে বাধা দেয়নি। এই যে এত তোড়জোড় চলছে সারা বাড়িতে, সেই কাজের কোনওটাই অনিকে করতে বলছে না কেউ। বাবা যেমন ছাদে এসে সব সামলাচ্ছেন, মা আর ঠাকুরমা তেমন শোয়ার ঘরে বসে পেনসিল বক্স, ছোট্ট কিন্তু সুন্দর দেখতে পেনসিল কাটার এবং আরও নানা জিনিস ভাল করে প্যাক করছেন। অনির বন্ধুরা গিফ্‌ট দিতে এলে এই সব জিনিস রিটার্ন গিফ্‌ট হিসেবে অনিও তাদের দেবে।

অনির ভারী ভাল লাগছিল। এক-এক বার মনে হচ্ছিল, রোজই যদি জন্মদিন হত, তা হলে কী সুন্দর ব্যাপারই না হত!

এমন সময় নীচ থেকে মায়ের গলা শোনা গেল, "অনি, তাড়াতাড়ি রেডি হয়ে নে। এ বার সবাই আসা শুরু করবে।"

অনি দ্রুত নেমে এল দোতলায়। দেখল, মা, ঠাকুরমা সবাই তৈরি। ঠাকুরমার হাতে একটা প্যাকেটে সব রিটার্ন গিফ্‌ট ভর্তি। ওই প্যাকেট নিয়ে ঠাকুরমা ছাদে যাবেন। অনি আর দেরি করল না। তাড়াতাড়ি ঘরে গিয়ে নতুন কেনা পাজামা-পাঞ্জাবি পরে ফেলল। তার সঙ্গে মানানসই স্ট্র্যাপ দেওয়া চটি কেনা হয়েছে। সেটা পায়ে গলিয়ে ছাদে এসে ও দেখল, কয়েক মিনিটে ছাদ পুরো পাল্টে গিয়েছে।

জন্মদিনের কেক এনে রাখা হয়েছে ছাদের মাঝখানে। বেলুন উড়ছে নানা কোণে। ত্রিপল টাঙানো শেষ। সবচেয়ে বড় কথা, ওর বন্ধুরা প্রায় সবাই এসে পড়েছে। সবার এক হাতে এক-একটা বড় প্যাকেট। অন্য হাতে আম-পোড়ার শরবত। মা দুটো মোমবাতি কিনে এনেছেন। মোমবাতি দুটো দেখতে ইংরেজি এক এবং শূন্য সংখ্যা দুটোর মতো। মা মন দিয়ে সেই দুটো মোমবাতি কেকের উপর বসাচ্ছেন।

সবাইকে বেশ খুশি খুশি লাগছিল।

গোলমাল শুরু হল মোমবাতি জ্বালতে গিয়েই। অনিকে পাশে নিয়ে মা মোমবাতি দুটো জ্বালিয়ে সোজা হতে যাবেন, এমন সময় একটা দমকা হাওয়া দিল। আর সেই হাওয়ায় শুধু মোমবাতি নয়, ছাদের সব আলো ঝপ করে নিভে গেল। দিন কয়েক ধরেই প্রবল গরম পড়েছিল। আজ দুপুর থেকে কোনও হাওয়া দিচ্ছিল না। বিকেলে হালকা মেঘ জমছিল আকাশে। কিন্তু জন্মদিনের উৎসাহে কেউই ওই দিকে বিশেষ নজর দেয়নি। এ বার মুহূর্তের মধ্যে এলোপাথাড়ি হাওয়া বইতে লাগল।

কেউ এক জন বলে উঠল, "এই রে, ঝড় উঠেছে। কালবৈশাখী!"

কথাটা শেষ হল না, অনি টের পেল মাথার উপর প্রবল ঝটাপটি। উপরে তাকিয়ে ও দেখল, প্রশান্তবাবুর সেই হরিনাম সংকীর্তনের ত্রিপল হাওয়ার চাপে প্যারাসুটের মতো ফুলে উঠেছে। তার পর পট পট পট আওয়াজ হতে লাগল। যে দড়িগুলো দিয়ে বাঁশের সঙ্গে ওই ত্রিপল বাঁধা, সেগুলো ছিঁড়তে থাকল। আর চোখের পলকে সব বাঁধন ছিঁড়ে ত্রিপলটা আরব্য রজনীর কার্পেটের মতো হাওয়ায় উড়তে উড়তে চলে গেল। এক মিনিটের মধ্যে ছাদের সব কিছু লন্ডভন্ড হতে শুরু করল। তুমুল হাওয়ায় সব উল্টে পড়তে লাগল। ত্রিপল উড়ে যেতেই বৃষ্টির বড় বড় ফোঁটা সবার মাথায় এসে পড়ল।

বাবার গলা পেল অনি, "প্রশান্তবাবু কোথায়? জেনারেটারের লাইন...এই, এই... চেয়ার-টেবিল সামলে...উড়ে যাচ্ছে সব। স্টোভ..."

"ওরে বাবা, গেছি গেছি," বলে পাড়ার বিশ্বজিৎজেঠু আর্তনাদ করে উঠল। অনি তাকিয়ে ওই অন্ধকারে যেটুকু বুঝতে পারল তা হল, ঝড়ের দাপটে একটা বাঁশ ভেঙে পড়েছে জেঠুর পিঠে।

ছাদের মধ্যে এক হুলস্থুল শুরু হয়ে গেল। ছাদে তখন জনা চল্লিশেক লোক। তার উপর এক কোণে রান্না বসেছে। আর-এক কোণে আম-পোড়া শরবতের স্টল। চেয়ার-টেবিল। কেকের টেবিল। অন্ধকার। সেই অন্ধকারে আচমকা সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো প্রবল হাওয়া। সেই হাওয়ায় উড়তে লাগল নানা শব্দ। অনি ছাদের এক ধারে সরে এসে শুনতে লাগল সেই সব কথা।

“এই আমার হাত খুঁজে পাচ্ছি না। আমায় কেউ ধর।”

“প্রশান্তবাবু! জেনারেটর... স্টোভের আগুন না ধরে যায়।”

“সবাই মিলে সিঁড়ির দিকে দৌড়োলে কিন্তু খুব বিপদ।”

“ আরে, জেনারেটরে বেশি তেল নেই।”

“এহ্, বাবা! এটা কী গায়ে এসে পড়ল!”

অন্ধকারে কে, কাকে, কী বলছে বোঝা যাচ্ছিল না। অনি দেখার চেষ্টা করল, কে কোথায় রয়েছে। কিন্তু ছাদ জুড়ে নানা বয়সি চল্লিশ জনের দাপাদাপি চলছে। এই অবস্থায় কে যে কোথায়, কিছুই আন্দাজ করতে পারল না। ও দিকে ঝড়ের দাপট বাড়ছে।

নীচ থেকে কারও আর্তনাদ শোনা গেল। সেটা শুনে ছাদে কেউ বলে উঠল, “আরে, আলুর বস্তাগুলো সামলাও। বস্তাটা ছাদের দেওয়ালে কাত হয়েছে। আলুগুলো তো নীচে পড়ে যাচ্ছে।”

অন্ধকারে চোখ সয়ে এসেছে। এ বার অনি অল্প অল্প দেখতে পাচ্ছিল। বাবাও ছাদের এক ধারে ঠাকুরমাকে ধরে দাঁড়িয়ে। মা রয়েছেন বাবার পাশে। ছাদের দরজার সামনে বিরাট জটলা। ছাদের মাঝখানে চেয়ার-টেবিল উল্টে। সেখানে জল-জল কিছু পড়ে। ওটা জল না আম-পোড়া শরবত ধরতে পারল না অনি। তবে ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টিও তো পড়ছে! এ বার ও দেখতে পেল, ডেকরেটরের বাঁশের খুঁটিগুলো উপড়ে যাচ্ছে হাওয়ায়। দুটো খুঁটি তো ছাদের বাইরে ছিটকে পড়ল। ও পাশে রান্নার সরঞ্জামও নষ্ট হয়ে গিয়েছে। তবে স্টোভটা নেভাতে পেরেছে দু'জন মিলে।

এক-দু'মিনিটেই জেনারেটরে আলো জ্বলল। তখন ঝড় প্রবল ভাবে বইলেও লোকজন অনেকেই দোতলায় নেমে গিয়েছেন। মা দৌড়োলেন দোতলায়। পিছন পিছন ঠাকুরমা। বাবা, ডেকরেটরের লোকেরা আর অনি ছাদে। আলো জ্বলতেই ছাদের পরিস্থিতি পরিষ্কার দেখা গেল। আর সেই পরিস্থিতি দেখে অনির চোখে জল চলে এল।

ছাদে আর কিছুই প্রায় নেই। রান্নাবান্না উল্টে গিয়েছে। আম-পোড়া শরবত থই থই করছে ছাদের মেঝেয়। রিটার্ন গিফ্‌টগুলো সেই শরবতে মাখামাখি হয়ে গড়াগড়ি দিচ্ছে। কেকের টেবিল উল্টে আছে এক দিকে। কিন্তু কেকটা নেই। বন্ধুদের দেওয়া গিফ্‌টও যে কোথায় কোথায় ছড়িয়ে, অনি আর খেয়াল করতে পারল না।

বাবার তত ক্ষণে চোখ পড়েছে অনির উপর। তিনি প্রায় ধমক দিয়ে বললেন, “তুমি এখানে কী করছ? তাড়াতাড়ি নীচে যাও। দেখছ না, কী জোরে হাওয়া দিচ্ছে।”

অনি মনমরা হয়ে নীচে নামল। সেখানে তখন আর-এক পর্ব। প্রথমেই অনির চোখ পড়ল কাবেরীকাকিমার উপর। কাকিমা বেশ মোটাসোটা। কোথাও গিয়ে দাঁড়ালে সবার চোখ এমনিতেই তাঁর উপর পড়বে। কিন্তু অনির চোখ পড়ল একেবারে অন্য কারণে। কাকিমার সারা মুখে, গলায়, গায়ে ওর জন্মদিনের কেক মাখামাখি হয়ে আছে। কেকের উপরে একটা গোলাপ ছিল। সেটা লেপ্টে আছে কাকিমার কপালে। ঝড়ের তাণ্ডব, গায়ের উপর কেক এসে পড়ায় কাকিমা এতই মুহ্যমান হয়ে পড়েছেন যে, ওই কেক মোছারও কোনও চেষ্টা করেননি তিনি। শুধু কাঁদো কাঁদো মুখে কাউকে কিছু বলছিলেন।

অন্য দিকে দিদিমাকে নিয়ে আমন্ত্রণ এসেছিল। তিনি দৌড়ে পালাতে গিয়ে পড়ে গিয়েছেন। বাঁ হাতে, হাঁটুতে চোট লেগেছে। একটা চেয়ারে বসে তিনি খালি বিড় বিড় করছেন, “আমার হাত, আমার হাত! উফ, পড়ে গিয়ে হাতটা খুঁজেই পাচ্ছিলাম না।”

ঠাকুরমা গিয়ে ওঁর পাশে বসলেন। হাতে মলমের টিউব। কিন্তু ঠাকুরমা সেই মলম আঙুলে নিয়ে বৃদ্ধার ব্যথার জায়গায় ছোঁয়াতেই তিনি চিৎকার করে উঠলেন, “উরে বাবা রে! ভেঙে গেছে রে!”

অনি এ বার দেখল ওর বন্ধুদের। তিন্নির চুলগুলো শজারুর কাঁটার মতো খাড়া হয়ে আছে। সারা গায়ে ধুলো। অনিমিত্রের গায়ে কালো কালো কী সব লেগে। শৌভিকের প্যান্ট ভিজে গিয়েছে আম-পোড়া শরবতে।

এমন অবস্থায় বাইরে হু হু করে প্রবল হাওয়া বইছে। ঝড় থামার কোনও লক্ষণ নেই।

মা এ বার ওর দিকে তাকিয়ে খিঁচিয়ে উঠলেন, “হাঁ করে দেখছিস কী! নীচ থেকে কয়েকটা চেয়ার এনে দে। সবাই বসবে তো!”

অনির কান্না পেয়ে গেল। দুপুর থেকে কত কী ভেবেছিল এই সন্ধেটা নিয়ে। অনেক কষ্টে সেই কান্না গিলে ও অন্ধকার সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামতে লাগল। এমন সময় প্রশান্তবাবু হুড়মুড় করে ওর পাশ দিয়ে উঠতে উঠতে বলতে লাগলেন, “সর্বনাশ হয়েছে! কেলেঙ্কারি কাণ্ড।”

থমকে গেল অনি। জিজ্ঞেস করল, “কী হয়েছে কাকু?”

প্রশান্তবাবু লাফিয়ে উঠতে গিয়ে থেমে গেলেন। অন্ধকারে চোখ কুঁচকে দেখার চেষ্টা করলেন, কে প্রশ্ন করল। তার পর বললেন, “কে অনি? আর বোলো না বাবা, সেই হরিনাম সংকীর্তনের ত্রিপল উড়ে গিয়ে পড়েছে দুটো বাড়ি পরে। আর পড়বি তো পড় ইলেকট্রিকের তার, কেবল লাইনের তার সব ছিঁড়ে নিয়ে লম্বালম্বি পড়েছে বাড়ির উপর। সেটাও দোতলা বাড়ি। সেই বাড়ির সামনের দিক পুরো ঢেকে গিয়েছে ত্রিপলে। সেই ত্রিপলের সঙ্গে আবার ইলেকট্রিকের তার জড়ানো। বাড়ির লোকজন ত্রিপল ধরতে ভয় পাচ্ছে। আবার ত্রিপল না-সরিয়ে তো দরজা খুলে বেরোতেও পারছে না। এই সবের জেরে এলাকার লোকজন খেপে গিয়েছে আমার উপর। তুমি বলো তো বাবা, ঝড় কি আমি তুলেছি? না আমি ত্রিপলটাকে বুদ্ধি দিয়েছি ওই ভাবে উড়ে গিয়ে সব তার-ফার ছিঁড়ে পরের বাড়িতে গিয়ে পড়ার!”

প্রশান্তবাবু কথাগুলো বলতে বলতে উঠে গেলেন। আর নীচে নেমে অনি দেখল ডেকরেটরের একটা ছেলের কপাল ফোলা। রান্না করছিল এমন এক জনকে সে সমানে মেজাজ দেখিয়ে বলে যাচ্ছে, “ঝড় উঠছে দেখে আলুর বস্তা চাপা দিতে পারোনি? কী ভাবে কাজ করো!”

রান্নার লোকটিও কম যায় না। সে-ও পাল্টা বলে চলেছে, “আলুর বস্তা দেখতে গেলে গোটা বাড়িতে আগুন জ্বলে যেত। আমি স্টোভ নেভাব না আলু দেখব? ঝড় উঠেছে যখন, তখন তুমি বাড়ির নীচে খোলা জায়গায় না-দাঁড়িয়ে কোনও ছাউনির তলায় গেলেই তো পারতে! তা-ও ভাল আলু পড়েছে। স্টিলের গামলাটা পড়লে কী হত ভেবে দেখেছ?”

দুটো প্লাস্টিকের চেয়ার কোনওমতে উপরে নিয়ে গিয়ে অনি দেখল বাবা তত ক্ষণে ছাদের কয়েকটা চেয়ার নীচে পাঠিয়ে দিয়েছে। এ বার বাবা আর মা ফিস ফিস করে আলোচনা করছেন।

বাবা বলছেন, “এত লোকের খাওয়ার কী হবে? রান্না তো সব নষ্ট হয়ে গিয়েছে।”

“ভাতে-ভাত বসিয়ে দেব? মনে তো

হয় না কেউ বাড়িতে রান্নার ব্যবস্থা করে এসেছে। আর কী লজ্জার ব্যাপার বলো তো! নেমন্তন্ন করে এনে... ছি ছি।"

"ধুর ভাতে ভাত," বাবা বিরক্ত হয়ে বললেন, "এখানে কেউ ফ্যানাভাত খাবে ভেবেছ! নাকি এমন অনুষ্ঠানে ওই সব দেওয়া যায়। আমি ভাবছি পাড়ার কোনও দোকানে অর্ডার দেব।"

"কিন্তু চল্লিশ জনের খাবার পাবে?"

"দেখি। অন্তত বাচ্চাগুলোর জন্য তো কিছু ব্যবস্থা করতে হবে।"

বাবা বেরিয়ে গেলেন। আর মা গিয়ে সবাইকে হাসি হাসি মুখ করে বলতে থাকলেন, "কী ঝড় বলুন তো! দুপুর থেকে দেখে এক বার বোঝাও যায়নি যে এমন হবে।"

বিশ্বজিৎজেঠুর পিঠের ব্যথা বোধ হয় এখনও কমেনি। একটু ঝুঁকে বসে রয়েছেন তিনি। সেই অবস্থায় বেজার মুখে জেঠু বললেন, "আমি আগেই বুঝেছিলাম। বিকেলে যখন মেঘ করছিল তখনই জানতাম, আজ প্রবল ঝড় উঠবে। তোমাদের উচিত ছিল নীচে কোনও ব্যবস্থা করা। এপ্রিল মাসে কেউ ছাদে অনুষ্ঠান করে? উফ!"

জেঠু সোজা হয়ে বসতে গিয়ে ফের ঝুঁকে পড়লেন।

ও দিক থেকে রুণুপিসিও একই ভাবে ঘাড় কাত করে বললেন, "হ্যাঁ বিশ্বজিৎদা, আমারও মন বলছিল আজ ঝড়-বৃষ্টি হবেই। আমার বাঁ পায়ের কড়ে আঙুলটা মাঝে মাঝে নিজের থেকে নড়তে থাকে। সেটা নড়লেই বুঝতে পারি ওই দিন কোনও প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঘটবেই।"

ঘরের আরও এক-দু'জন মাথা নাড়লেন। তাঁরাও নাকি আগেই বুঝতে পেরেছিলেন, আজ এমন প্রবল ঝড় উঠবে।

মা তবু চেষ্টা করছিলেন পরিস্থিতি সামলানোর। আর তখনই প্রচণ্ড জোরে বাজ পড়ল ধারে-কাছে কোথাও। সেই আওয়াজের পর আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নামল। এত বৃষ্টি যে ছাদে ডেকরেটরের যে লোকজন ছিল, সবাই দুড়দাড় করে নেমে এল। সবাই চুপচুপে ভিজে গিয়েছে কয়েক মুহূর্তের বৃষ্টিতে।

মা চার পাশ তাকিয়ে দেখলেন কোথাও দিয়ে জলের ছাঁট আসছে কি না। এমন সময় তাঁর ফোন বেজে উঠল। মা ফোন ধরে কিছু শুনলেন। অনি দেখল মায়ের মুখ আস্তে আস্তে ফ্যাকাসে হয়ে যাচ্ছে। 'হুঁ, হাঁ' করতে করতে মা একটু সরে এলেন ফাঁকায়। অনিও গুটি গুটি মায়ের কাছে এল।

মা ফোন ছাড়তেই জানতে চাইল, "কী হয়েছে মা?"

মা অন্যমনস্ক গলায় বললেন, "তোর বাবা বেরিয়েছিল খাবার কিনতে। কিন্তু প্রবল বৃষ্টিতে আটকা পড়েছে। কিন্তু তার চেয়েও বড় সমস্যা হল বিশ্বাসবাবুরা..."

বিশ্বাসরা হচ্ছে অনিদের পাশের বাড়ি। অনির দাদুর আমল থেকে বিশ্বাসদের সঙ্গে ওদের শত্রুতা। কথা বন্ধ। মাঝে এক বার দুই বাড়ির মাঝের পাঁচিল নিয়ে বিশ্বাসদের সঙ্গে অনিদের মামলা হতে হতেও হয়নি।

মা থেমে যেতেই অনি তাই বলল, "কী করেছে ওরা?"

মা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন। বললেন, "ঝড়ে একটা বড়সড় বাঁশ গিয়ে বিশ্বাসদের দোতলার কাচের জানলা ভেঙে শোয়ার ঘরে ঢুকে পড়েছে। এখন ওরা চেঁচাচ্ছে থানায় যাবে। তোর বাবা নাকি ঝড় ওঠার সুযোগ নিয়ে ইচ্ছে করে ওই বাঁশ ছুড়েছে। যাতে বিশ্বাসদের কেউ মারা পড়ে!"

অনি কী বলবে ভেবে পেল না। ও দিকে ঠাকুরমা ক্ষীণ গলায় মাকে ডাকলেন, "অ্যাই তুলি, তুমি এক বার জেনারেটরের লোকেদের সঙ্গে কথা বলো! আলো তো কাঁপছে। নিভে না যায়!"

ঘড়িতে এখন রাত সাড়ে এগারোটা। সন্ধেবেলার ঝড়-বৃষ্টি থেমে গিয়েছে। তবে কারেন্ট আসেনি। ওই হরিনাম সংকীর্তনের ত্রিপলই ট্রান্সফর্মারের তার ছিঁড়ে দিয়েছে। গোটা এলাকা অন্ধকার। আর অনিদের সারা বাড়ি লন্ডভন্ড। বাবা ঝড়জলের মধ্যে গিয়ে কোনও খাবার পাননি। কোনও মতে অনির বন্ধুদের জন্য কয়েকটা চিকেন রোল কিনে এনেছেন। তাও দোকান খুলিয়ে। বেশি দাম দিয়ে। বাকিরা কেউ বাড়ির রান্না খেতে চাননি। না খেয়েই চলে গিয়েছেন। তার মধ্যে আমন্ত্রণের দিদিমার জন্য একটা গাড়ির ব্যবস্থা করতে হয়েছে। তিনি কিছুতেই হাঁটতে পারছিলেন না। খালি বলছিলেন, "হাতটা তো গেছেই। হাঁটুটাও বোধ হয় ভেঙেছে..."

সেই গাড়িতে বিশ্বজিৎজেঠুকেও তুলে দেওয়া হয়েছে। তিনিও বার বার সোজা হওয়ার চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু পারছিলেন না।

বাড়িতে কারও খাওয়া হয়নি। শুধু অনির জন্য একটা চিকেন রোল আনা হয়েছিল। অনি খেয়েছে। আর ঠাকুরমা মুড়ি জলে ভিজিয়ে খেয়ে শুয়ে পড়েছেন। বাবা-মা দু'জনেই অভুক্ত।

শোয়ার ঘরে একটা মোমবাতি জ্বেলে বাবা-মা পাথরের মতো বসে। পাশে অনি।

অনেক ক্ষণ বাদে বাবা বললেন, "বদনাম হয়ে গেল।"

মা বললেন, "ছেলেটার জন্মদিন খুব বড় করে করব ভাবলাম। কী থেকে কী হয়ে গেল! ঝড়টা হবি তো হ, সেই সময়ই হতে হল! পাড়ায় আর মুখ দেখাতে পারব না। সবাই না-খেয়ে চলে গিয়েছে।"

বাবা বললেন, "রাতের দিকে শ্যামল বিশ্বাসকে ছাতা মাথায় বেরোতে দেখলাম। থানায় গেল কি না, বুঝতে পারছি না।"

মা এ বার অনির দিকে তাকালেন। অনি একেবারে চুপ। মা আলতো করে অনির মাথায় হাত বোলালেন। বললেন, "সামনের বছর তুই এগারোয় পড়বি। একের পিঠে এক। মানে নতুন ডেকেড শুরু হবে তোর জীবনে। সেই জন্মদিনটা আরও বড় করে করব। আর কোনও গোলমাল হবে না। প্রমিস।"

বাবা এ বার নড়েচড়ে উঠলেন। বললেন, "দেখেছ, সন্ধেবেলার ঝামেলায় আসল জিনিসটার কথাই তো ভুলে গিয়েছি। অনিকে তো আমাদের গিফ্‌টটাই দেওয়া হয়নি।"

মা মুখ টিপে হাসলেন। তার পর আলমারি খুলে জামাকাপড়ের আড়াল থেকে একটা লম্বা প্যাকেট বের করে অনির হাতে দিলেন। বললেন, "এখনও বারোটা বাজেনি। জন্মদিন ফুরোয়নি। হ্যাপি বার্থডে মাই বয়।"

সারা দিনের ঝক্কিতে অনি ভুলেই গিয়েছিল বাবা-মা'র গিফ্‌টটা না-পাওয়ার কথা। এ বার ও এক লাফে বিছানা থেকে নেমে গিয়ে মা'র হাত থেকে প্যাকেটটা নিল। তাড়াতাড়ি প্যাকেট খুলল। তার পর মোমবাতির আলোয় ওর চোখ দুটো চক চক করে উঠল। ওর হাতে ধরা বাবা-মা'র দেওয়া গিফ্‌ট। একটা নতুন ক্রিকেট ব্যাট।

ছবি: রৌদ্র মিত্র

রেডি-স্টেডি-গো ডিগবাজি (পর্ব-১২)
কাহিনি ও ছবি: সুযোগ বন্দ্যোপাধ্যায়
কী হল বলো তো ব্যাপারটা! ওফ!
কেউ যেন স্কুটারটা ছুড়ে ফেলে দিল তুলে!
আরে এ কী! ওই দ্যাখো!
আরে! গো কোত্থেকে এল!
আমি তোমাদের দেখেছি খানিক আগেই! লোক দুটোকে একটু ডিগবাজি খাওয়ালাম! বাজে লোক!

আর আমাদের কী হবে?
এখানে বাজে লোকই গিজগিজ করছে। এখানে বেশ কিছু দিন থাকতে হবে আমাকে! এক্ষুনি ফিরে গেলে অনেক ক্ষতি হয়ে যাবে, বুঝলে?
তোমাকে যে খুঁজে পেয়েছি এই ভাগ্যি! তোমাকে আর কাছছাড়া করা যাবে না। তুমি ছাড়া আমাদের জীবন ফিরে পাওয়ার উপায় নেই!
আপাতত এই বদমাশ দুটোকে একটু ভড়কে দাও! কুইক!
চলো! একটু টুপিটা নিয়ে খেল দেখাও! তা হলেই হবে!
এ কী! টুপিটা নিজে নিজে নাচছে!
বাঁচাও! এ সব ভূতুড়ে ব্যাপার! এই লোকটা বোধ হয় ভূত পোষে!

দৌড় লাগাও! ওফ! প্রাণ নিয়ে পালাতে পারলে বাঁচি।
এহ হে! তোমার স্কুটারটা ফেলে এলে! পুরনো হলেও কাজে লাগত!
লোকগুলোকে তো তাড়ালাম! এ বার? তোমার পিছুন পিছুন ঘুরে বাকি জীবনটা কাটাব?
এ বার এখানে কিছু দিন থাকতে হবে। বললাম যে, বেশ কিছু বাজে লোককে ডিগবাজি খাওয়াতে হবে! তার পর মহাকাশযানটা সারানোর ব্যবস্থা করব!
শোনো, তোমরা মানুষেরা সত্যি কথা বলতে কী, অত্যন্ত পাজি অসভ্য একটি জাতি। অনেক অপরাধের গন্ধ পাচ্ছি। সব ক'টাকে ডিগবাজি খাওয়াতে হবে। তোমরা আমাকে হেল্প করবে! আপাতত এটাই কাজ।
তার পর আবার আমাদের মানুষ করে দিয়ো প্লিজ়! আত্মা হয়ে ফ্যা ফ্যা করে কত দিন ঘুরব বলো!

স মা প্ত

১	২	■	■	■	৩	৪	৫
৬			৭	■	■	৮	
	■	■	৯	১০	■		■
■	১১	১২	■	১৩	১৪		
১৫			১৬	■	১৭		■
■		■	১৮	১৯	■	■	২০
২১		■	■	২২		২৩	
২৪			■	■	■	২৫	
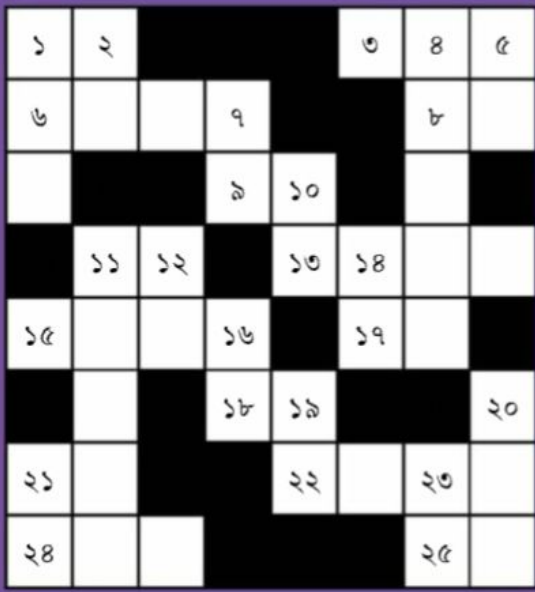
পাশাপাশি

১। সপ্তম সংখ্যক।
৩। তেতো এই পাতার রস কাশি নিরাময় সহায়ক।
৬। বেশ গভীর কাটলে রক্ত যে ভাবে নির্গত হয়।
৮। নিযুক্ত।
৯। বৃহত্তম প্রাণী।
১১। যার মাংস খুবই উপাদেয়।
১৩। বারণ, নিষেধ, ঠেকানো।
১৫। সেদ্ধ না হলে মাংস যেমন স্বাদ উৎপন্ন করে।
১৭। বেশি-র উল্টো।
১৮। সূর্য।
২১। মুণ্ডুর সঙ্গে সংলগ্ন দেহের বাকি অংশ।
২২। সাদা এই ফলটির বাইরেটা বাদামি।
২৪। সোনা।
২৫। চলো...ক্যাসুরিনা— একটি জনপ্রিয় আধুনিক গান।

উপর-নীচ

১। সমুদ্র।
২। গভীরতা।
৪। ব্যস্ত।
৫। সংখ্যাবাচক জিজ্ঞাসা।
৭। কানের নীচের নরম অংশ।
১০। কাবুলিওয়ালা গল্পে বাচ্চা মেয়েটির নাম।
১১। রান্নায় ব্যবহৃত একটি চেনা মশলা।
১৪। কথা।
১৬। নদী বা জলাশয়ের বুকে জেগে ওঠা ভূখণ্ড।
১৯। ব্যতীত।
২০। মেয়ে।
২১। ভয় পেলে বুক যেমন করে উঠে।
২৩। উইলিয়াম...ছিলেন আঠারো শতকের এক জন বিখ্যাত ব্রিটিশ ধর্মপ্রচারক, শিক্ষাবিদ ও আরও অনেক গুণের অধিকারী।

গত সংখ্যার সমাধান

ধ	রা	■	■	ব	র	ব	টি
লা	জ	■	ব	দ	ন	■	প
■	ন	গ	র	■	■	বা	■
সা	■	র	■	ব	স	বা	স
র	বি	বা	র	■	রো	■	ম
■	ল	■	■	ব	দ	র	■
শি	■	ম	শা	ল	■	জ	ল
শি	হ	র	ন	■	■	ন	তি

শালুক

নিজের হাতে

কাগজের তিমি

উপকরণ: নীল, সাদা, লাল ও কালো রঙের অরিগ্যামি কাগজ, কাঁচি, কম্পাস, আঠা।

কী ভাবে করবে:

১। ছবি দেখে প্রথমে নীল ও সাদা রঙের বড় দুটো গোল কেটে নাও।
২। এ বার লাল কাগজটা কাটতে হবে আধখানা চাঁদের মতো।
৩। তিমির পাখনার জন্য নীল কাগজটার বাকি অংশ ছবি দেখে কেটে নাও।
৪। এ বার রইল বাকি চোখ আর দাঁত। চোখের জন্য সাদা আর কালো জোড়া গোল কেটে নাও। আর দাঁতের জন্য কেটে নাও ছোট ছোট ত্রিভুজ আকার।
৫। এ বার সাদা বড় গোলটাকে আধখানা করে কেটে নাও। আর সেই অর্ধেক সাদা কাগজটা নীল গোলটার নীচের দিকে ছবি দেখে লাগিয়ে ফ্যালো।
৬। তার পর তিমির তিন দিকে ছবি দেখে তিনটে নীল পাখনা সেঁটে দাও আঠা দিয়ে।
৭। এ বার লাল কাগজ, চোখ আর দাঁতগুলো ছবি দেখে একের পর এক বসিয়ে ফ্যালো!
ব্যস, তা হলেই তৈরি কাগজের দাঁতালো তিমি।

বৈশালী সরকার

১ কাগজের তিমির উপকরণ

২ কাগজের তিমি

বাঘ ব্রহ্ম খেলা

রূপম ইসলাম

*(**আগে যা হয়েছে:** ব্রহ্ম ঠাকুর আশ্চর্যকে কিছু মাস্ক আর ওষুধ দেখালেন। বললেন অস্বাভাবিক গ্যাস ঢুকতে শুরু করলেই আশ্চর্যকে এই মাস্ক পরিয়ে দেবেন। আর তরলটির ব্যবহার জানার আগেই আশ্চর্যর এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা হল। বাথরুমে ঢুকে আয়নায় নিজের বদলে এক ক্ষত-বিক্ষত বৃদ্ধ মানুষের প্রতিচ্ছবি দেখতে পেল। তিনি আবার আঙুল তুলে কী সব বলতে চাইলেন। প্রচণ্ড ভয় পেয়ে ব্রহ্ম ঠাকুরকে এসে সব বলল আশ্চর্য। এ দিকে সিডের অপ্রকাশিত গানের লিরিক পড়তে পড়তে উত্তেজনায় অস্থির এরিক দত্ত। তবে কি এ বার পাওয়া যাবে গুপ্তধনের সঙ্কেত? সবাই মিলে স্পুল চালিয়ে আবার গানগুলো নতুন করে শোনা শুরু হল। শোয়ার পরে যান্ত্রিক সিগন্যালের কম্পনে ঘুম ভেঙে গেল এরিক দত্তর। এর পর...*

ঘুমের দফারফা। ভাইব্রেট করে উঠেছে এরিকের ডান হাতের কনুইয়ের কাছে পরা লুকোনো আর্মব্যান্ড। এটা একটা সুপারসনিক যোগাযোগ ব্যবস্থা, যা এখনও পর্যন্ত বিশ্বে প্রচলিত কোনও টেকনোলজি ইন্টারসেপ্ট করতে পারেনি। এটা তৈরি করেছেন টোকিয়োর বিজ্ঞানী ড. কিশিমোতো— যিনি বিটিটু প্রকল্পের অন্যতম টেকনিক্যাল ডিরেক্টর। এতে যে-কোনও প্রয়োজনে নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ রাখতে পারেন প্রকল্পের মাথারা— এরিক দত্ত, ব্রহ্ম ঠাকুর

এবং আরও দু'-এক জন। তবে আজও কেউ ইন্টারসেপ্ট করতে পারেনি বলে যে কালও পারবে না— তা তো না। তাই কিশিমোতো বলে রেখেছেন, অত্যন্ত কম ব্যবহার করতে হবে এই সিস্টেম। যত কম ব্যবহার করা হবে, তত এর উপস্থিতি কম মাত্রায় ধরা পড়বে শত্রু পক্ষ, অর্থাৎ 'দ্য হিডেন ব্যালেন্স'-এর রেডারে।

ব্রহ্ম ঠাকুরের সুটকেসের মধ্যে একটা গোপন জায়গায় লুকোনো আছে এই ব্যবস্থার একটা ছোট্ট ট্রান্সমিটার। ব্রহ্মই আজ কল করেছেন এরিককে। এই ধরনের বেতারবার্তায় গড়গড় করে কথা বলতে হয়। এক জন কথা বলা শেষ করে একটা বোতাম টেপেন। তখন অন্য জন জবাব দেন। এরিক ঘুম-চোখে কলটা রিসিভ করতেই ব্রহ্ম ঠাকুর বলতে শুরু করলেন, "হ্যালো এরিক, কেমন আছ? তুমি আজ ডার্ক ওয়েবে যে ছবিটার লিঙ্ক পাঠিয়েছ, সেটা একটা আশ্চর্য সমাপতন। এ রকম এক জনের ছবি তুমি পাঠাবে, ভাবিনি। এই ছবির সঙ্গে ম্যাক্সিমাম ম্যাচ করেছে যে ব্যক্তির ছবি, তাঁর ছবি টাঙানো আছে অদ্ভুত ভাবে তোমারই শহর ফ্র্যাঙ্কফুর্টের সেই বিখ্যাত সামাজিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান 'ইনস্টিটিউট ফর সোশ্যাল রিসার্চ'-এর দেওয়ালে। নামটা আমি লিখে পাঠিয়েছি। তুমি নিশ্চয়ই আঁচ করেছ যে, আমি এখন ইংল্যান্ডেই আছি। আমি আছি এপিং ফরেস্ট ডিস্ট্রিক্টের ম্যাচিং বলে একটা গ্রামের এক পুরনো প্রাসাদোপম বাড়িতে। মজার ব্যাপার হল, এই বাড়িটার সঙ্গে বোধ হয় তোমার ছবির রহস্যময় লোকটির একটা গভীর সম্পর্ক আছে। এ ব্যাপারে অবশ্য আমি নিঃসন্দেহ নই, আরও প্রমাণ জোগাড়ের চেষ্টা করছি। বাড়িটার এক তলাটায় সিঁড়িটুকু বাদ দিয়ে একটাই টানা লম্বা ঘর আছে বলে অনুমান করলাম। কারণ, পিছনের বাগান থেকে ওই দেওয়ালে একটি মাত্র জানলা আছে, সেটা দেখলাম। পিছনের বাগানে আছে হিংস্র জানোয়ারে ভরা এক চিড়িয়াখানা। চিড়িয়াখানাটা দেখতে যাওয়ার সময় ইচ্ছে করে পিছিয়ে পড়ে এক তলার জানলা দিয়ে ভিতরে যেটুকু দেখতে পেলাম, তা দেখে একটা পুরনো বিজ্ঞানীর আখড়া বলেই মনে হল— বুনসেন বার্নার আর কয়েকটা টেস্টটিউব
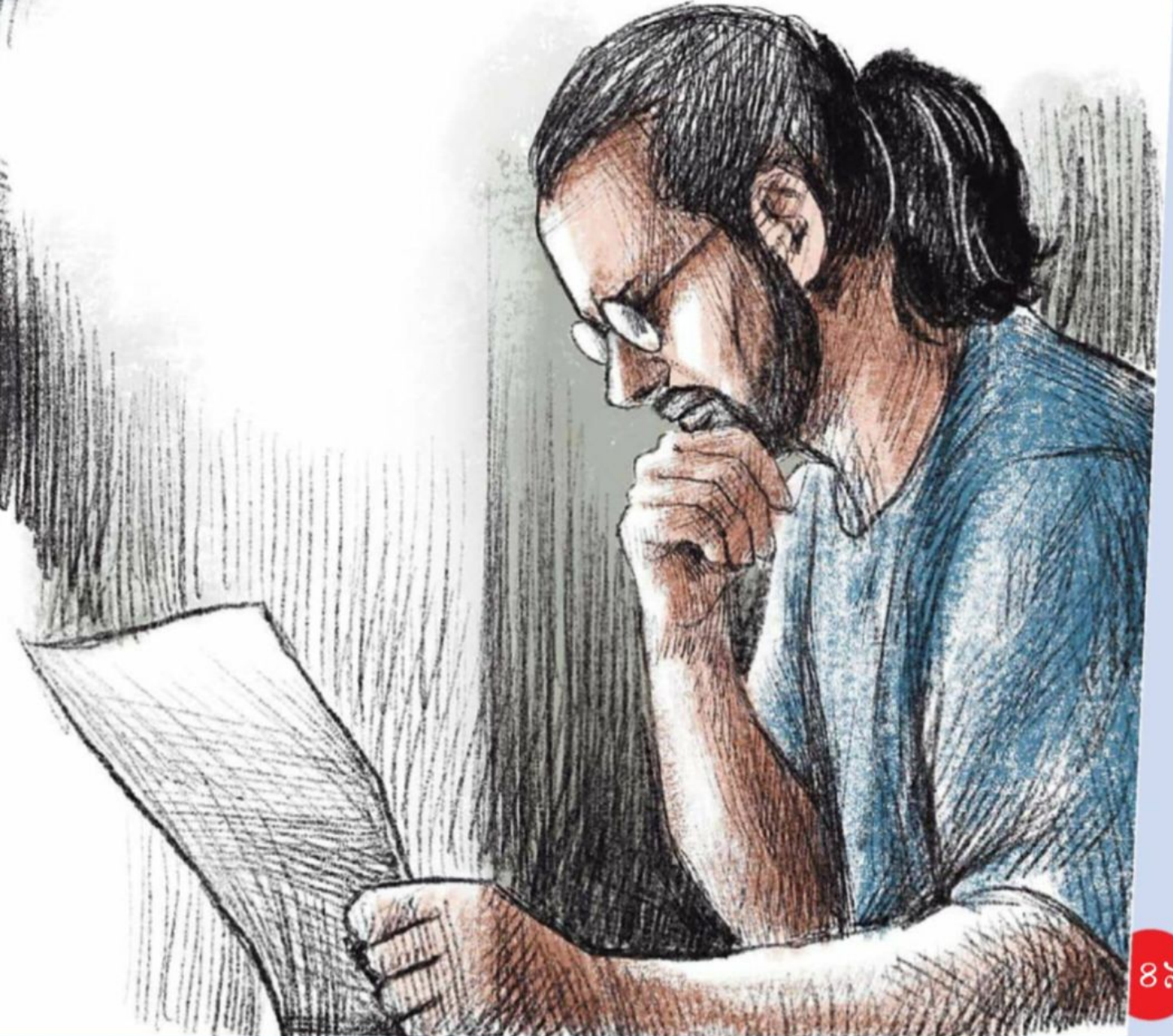
দেখতে পেলাম, একটা বোর্ডে কী সব যেন হিসেব লেখা, কয়েকটা রেডিয়ো সিগন্যাল রিসেপ্টর যন্ত্রও দেখলাম উঁকি মেরে। ঘরটা কিন্তু ব্যবহার করা হয় না, ধুলো আর মাকড়সার জালে মাখামাখি। এই সব মান্ধাতার আমলের বৈজ্ঞানিক যন্ত্রগুলো নিশ্চয়ই বাড়ির পুরনো মালিকেরই সম্পত্তি, আর কারই বা হবে? এবং মনে হয় এই ঘরটা নতুন করে সাজানো হবে, তার তোড়জোড় চলছে। এই সব পুরনো জিনিসগুলো ডাঁই করে রাখা আছে এক পাশে। চিড়িয়াখানাটা কেন আছে বলো তো? মনে হয় পশুগুলোকে এখানে রাখা হয়েছে এক বিশেষ প্রয়োজনে। এদের নিয়ে একটা গবেষণা চলছে বলে আমার অনুমান। বিশেষ কোনও ওষুধ এদের উপর প্রয়োগ করা হচ্ছে। একটি ওরাংওটাংয়ের ঝিম-ধরা চোখ দেখে আমার এটা মনে হয়েছে, তার উপরে গৃহকর্তার শরীরে আছে নিয়মিত আঁচড়ের দাগ। হয়তো ইঞ্জেকশন দিতে গিয়ে এই আঁচড় তিনি খেয়েছেন বা খেয়ে থাকেন। আর আছে একটা রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের খাঁচা। খাঁচাটার পিছনে একটা গোলমেলে ব্যাপার... আসলে একটা ব্যাপারের গন্ধ পেয়েই আমি তদন্ত শুরু করেছি। তদন্তের ফল মিললে তবেই তোমায় জানাব। ইন ফ্যাক্ট কয়েকটা বিষয়ে খটকা ছিল বলেই আমি স্বেচ্ছায় এখানে এসেছি। মনে হয় আগামী কালই এই রহস্যের যবনিকা পতন হবে।

"যাই হোক, যেটা বলার জন্য তোমায় কল করা... আমার সঙ্গে এ বার এসেছে তোমার খুব পেয়ারের ছেলেটি— ওই যে তরুণ অভিনেতা, আশ্চর্য! তবে তদন্তের এই পর্যায়ে ওকে ছাড়াই এখানে আমার সুবিধে হবে। ওর দিকে একটা রিভলভার কেউ তাক করে রাখলে আমি তো হ্যান্ডিক্যাপ্‌ড হয়ে যাব— বুঝতে পারছ আশা করি! তাই আগামী কাল তুমি একটা গাড়ি পাঠিয়ে দাও। নীল রঙের গাড়ি পাঠাবে, কেমন? আমরা এখানে নজরবন্দি থাকলেও কাল বেলা সাড়ে বারোটা নাগাদ আশ্চর্যকে বাড়ির বাইরে বের করে দেব আমি। কাছাকাছি তোমার পাঠানো গাড়ি অপেক্ষা করবে, ও সহজেই তোমার টিমে যোগ দিতে পারবে। না, এই মুহূর্তে ইংল্যান্ডে ওর একা থাকা বেশ ঝুঁকিপূর্ণ। তাই ওকে তোমার দলে পাঠাচ্ছি। তুমি তো জানোই ছেলেটি ভাল— আগের বার তোমায় তো ও-ই উদ্ধার করেছিল অনন্ত কারাবাসের আশঙ্কা থেকে! ওকে ব্যবহার কোরো, কেমন?"

এরিক বললেন, "ঠিক আছে। গাড়ি পাঠিয়ে দেব'খন। আশ্চর্য চলে আসুক। কিন্তু ঠিকানাটা বলো।"

ব্রহ্ম ঠাকুর বললেন, "ম্যাচিং ভিলেজের একদম শেষ প্রান্তের বাড়ি। বাড়িটার নাম হল— নিউম্যান'স এন্ড।"

ভীষণ ভাবে ভুরু কুঁচকে গেল এরিক দত্তের। কলটা কেটে দিয়ে তিনি ভাবতে শুরু করলেন, নিউম্যান'স এন্ড, নিউম্যান'স এন্ড— কথাটা যেন কোথায় শুনেছেন?' তার পর চকিতে কী যেন মনে পড়ায় খাট থেকে লাফ দিয়ে নামলেন এরিক। ছুটে গেলেন পাশের টেবিলে। টেবিলের উপর পেপারওয়েটের নীচ থেকে টেনে বের করলেন সিড ব্যারেটের লেখা মহামূল্য সেই অপ্রকাশিত চারটে লাইন। জোরে জোরে আবার পড়লেন লাইনগুলো—

Dives he once and flies twice
Twenty four is marked on dice
Aliens teaches the arc apart (এই লাইনটা ডেফিনিটলি বুঝতে ভুল হচ্ছে)
New man ends at Future's start

বলা বাহুল্য তাঁর সব কনসেনট্রেশন এখন শেষ লাইনটার দিকেই ধাবমান— বিশেষ করে ওই 'নিউ ম্যান এন্ডস' শব্দ তিনটের জন্য। একটু আগেই ব্রহ্ম ঠাকুর যে বাড়ির ঠিকানা বলেছেন, তার নাম নিউম্যান'স এন্ড। স্পষ্টই এখন মনে হচ্ছে এই দু'টি কথা সম্পর্কযুক্ত। তা হলে ব্রহ্ম ঠাকুর যে বাড়িটায় আছেন সেখানেই কি কিছু একটা ঘটেছিল, যেটাকে সিড 'ভবিষ্যতের শুরু' বলে বর্ণনা করেছেন? কিন্তু কী সেই ঘটনা?

এরিকের মনে হল, তিনি এবং ড. ব্রহ্ম ঠাকুর জড়িয়ে পড়েছেন একই ভয়ানক রহস্যের দুই কিনারে। যোগাযোগটা এখন যদিও খুবই ক্ষীণ এবং অনুমান সাপেক্ষ, তবুও যোগাযোগ একটা যে আছে, তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

॥ ১২ ॥

ম্যাচিং গ্রামের নিউম্যান'স এন্ড নামের বাড়িটায় একই সন্ধেয় এবং রাতে কী ঘটছিল, তা জানতে একটু পিছোতে হবে ঘড়ির কাঁটা। তবে পাঠকের চিন্তার কোনও কারণ নেই। এখন সময় পিছোলেও পরে আমরা আবার এসে পৌঁছোব ঠিক এই জায়গাটাতেই, অর্থাৎ ড. ব্রহ্ম ঠাকুরের এরিক দত্তকে সুপারসনিক টেলিফোন কল করার ঘটনাটায়।

রাত আটটা বেজে গেছিল। নিউম্যান'স এন্ড নামের বাড়িটার বর্তমান মালিক এবং অতিথিরা দিনটা শেষ করার পরিকল্পনা নিয়ে শয্যাগ্রহণই করে ফেলেছিল প্রায়। ব্যাঘাত ঘটল অন্যতম অতিথি আশ্চর্যর বাথরুমে ভূত দেখার ঘটনায়। পুরো ব্যাপারটাই জন চার্টওয়েলের চক্রান্ত— এটা আঁচ করলেন ব্রহ্ম ঠাকুর।

তার পর আশ্চর্যকে বললেন, "চলো তো। আজ এই ভূতের গল্পের একটা হেস্তনেস্ত না করলেই নয়। চলো, এক্ষুনি গিয়ে জনের সঙ্গে কথা বলি।"

এই বলে টেবিলে রাখা একই রকম দেখতে দুটো পাইপের মধ্যে থেকে একটা তুলে নিয়ে দাঁতে কামড়ে ধরলেন ব্রহ্ম। তাঁর মুখটা রাগে গন গন করছিল।

আশ্চর্য ভদ্র ছেলে। সে এই রাতের বেলা জনের ঘরে গিয়ে উপদ্রব করার ব্যাপারটায় একটু আপত্তি দেখিয়ে আমতা আমতা করছিল। ড. ঠাকুর ধমকে দিলেন তাকে। পাইপটা ঠোঁট থেকে ডান হাতে চালান করে বললেন, "একদম মেনি বেড়ালের মতো মিউমিউ করবে না। যা করবে, বাঘের মতো সদর্পে করবে। এই যে একলা একলা ভূত দেখলে, কেউ কি বলেছিল তোমায় ভূত দেখতে? দেখেই ফেলেছ যখন, তার একটা প্রতিক্রিয়া তো থাকবেই। চলো চলো, জন ব্যাটাচ্ছেলেকে পাকড়াও করি। ব্রহ্ম ঠাকুরের চোখকে ধুলো দেওয়া অত সোজা না। আর তোমাকেও বলিহারি! আয়নার কিনারগুলো মোটা ফ্রেমের তলায় লুকোনো— সেটা দেখেও বুঝলে না? আয়নার ফ্রেম ও রকম হয় থোড়াই? এটা তো বোঝাই যাচ্ছে এই আয়নাটা একটা থ্রি-ইন-ওয়ান ব্যাপার! আয়না, ক্যামেরা এবং লিকুইড ক্রিস্টাল ডিসপ্লে।

(ক্রমশ)

ছবি: রৌদ্র মিত্র

অষ্টম মহাদেশের মানচিত্র

জ়িল্যান্ডিয়ার মাঝে নিউ জ়িল্যান্ড

সুদূর অতীতে নিউ জ়িল্যান্ড একটা বড় মহাদেশের অংশ ছিল। কালক্রমে সেই মহাদেশের প্রায় সমস্তটাই মহাসমুদ্রের জলের তলায় ডুবে যায়। জলের উপর ভেসে থাকে শুধু নিউ জ়িল্যান্ড। জলের তলার এই মহাদেশের কথা অনেক আগেই জানতে পেরে ভূবিজ্ঞানীরা এর নাম দিয়েছিলেন, 'জ়িল্যান্ডিয়া'। সম্প্রতি তাঁরা এই মহাদেশের একটি বিশদ মানচিত্র প্রকাশ করেছেন।

প্রথম হাইড্রোজেন-বাস

নতুন দিল্লিতে সেই বাস

গত ২৫ সেপ্টেম্বর নতুন দিল্লির রাস্তায় নামল ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশনের তৈরি, এ দেশের প্রথম হাইড্রোজেন-চালিত বাস। হাইড্রোজেন পোড়ালে শুধুই জলীয় বাষ্প তৈরি হয়, যা, বলাই বাহুল্য, পরিবেশবান্ধব। জীবাশ্ম-জ্বালানির ভাঁড়ার ফুরিয়ে যাওয়ার আগেই এই বিকল্প শক্তির সন্ধান ভারতকে পরিবেশবান্ধব উন্নয়নের নতুন দিশা দেখাতে পারে।

প্রাচীনতম কাষ্ঠনির্মাণ

চলছে সেই খননকাজ

নৃতত্ত্ব বিজ্ঞান বলছে, উন্নত মানুষ *হোমো সেপিয়েন্স*-এর আবির্ভাব প্রায় ৩ লক্ষ বছর আগে। অথচ আফ্রিকার জ়াম্বিয়া ও তানজ়ানিয়ার সীমান্তের এক নদী-তীরে প্রত্নতাত্ত্বিকরা সম্প্রতি খুঁজে পেলেন প্রায় ৫ লক্ষ বছর পুরনো, কাঠের তৈরি কিছু গড়ন। ওই সময় স্থানীয় আদিম মানুষরা কাঠ কাটতে পাথরের যে যন্ত্রপাতি ব্যবহার করেছিল, খননকার্যে সেগুলোও পাওয়া গেছে। তার মানে *হোমো সেপিয়েন্স*-দের আগেও আদিম মানুষের বুদ্ধি নেহাত কম ছিল না!

দৈত্যাকার মাকড়সা

মানুষের হাতের তালুর সমান একটা মাকড়সার ১ থেকে দেড় কোটি বছর আগের জীবাশ্ম সম্প্রতি অস্ট্রেলিয়ায় খুঁজে পাওয়া গেছে। তাও একে 'দৈত্য' বলছি কারণ, এখনও অবধি সারা বিশ্বে খুঁজে পাওয়া দ্বিতীয় সবচেয়ে বড় মাকড়সা-জীবাশ্ম এটিই। অস্ট্রেলিয়ায় অবশ্য বেশি নয়, এই নিয়ে মাত্র ৪টি মাকড়সার জীবাশ্ম খুঁজে পাওয়া গেল।

এ-ই সেই জীবাশ্ম

ভারতীয় বায়ুসেনা দিবস

চলছে উদ্‌যাপনের মহড়া

ভারতে তখনও ব্রিটিশ শাসন। ১৯৩২ সালের ৮ অক্টোবর, জগদ্বিখ্যাত ব্রিটিশ রয়্যাল এয়ার ফোর্সের দোসর হিসেবে জন্ম নেয় ভারতীয় বায়ুসেনা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ব্রিটিশ বাহিনীর হয়েই লড়াইয়ে শামিল হয়ে উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব দেখিয়েছিল এই বাহিনীও। তখনও তার নাম 'রয়্যাল ইন্ডিয়ান এয়ার ফোর্স'। ১৯৪৭ সালে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর বাহিনীর নাম থেকে 'রয়্যাল' শব্দটা বাদ দেওয়া হয়। আজ ভারতীয় বায়ু সেনা বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম বায়ুসেনা। সঙ্গের ফটোয় এ বারের বায়ুসেনা দিবস উদ্‌যাপনের মহড়ার দৃশ্য।

আন্তর্জাতিক কন্যাসন্তান দিবস

কলকাতায় শিশুকন্যা

বিদ্যায়, বুদ্ধিতে, শক্তিতে মেয়েরা যে কোনও অংশেই ছেলেদের চাইতে কম নয়, এ কথাটা দুর্ভাগ্যজনক ভাবে আজও আমাদের আশপাশে অনেকেই মানতে চায় না। মেয়েদের সম্পর্কে এক শ্রেণির বিচ্ছিরি মানুষের ভাবনার এই দীনতা দূর করার লক্ষ্যে রাষ্ট্রপুঞ্জ ২০১১ সালে সিদ্ধান্ত নেয়, প্রতি বছর ১১ অক্টোবর পালিত হবে আন্তর্জাতিক কন্যাসন্তান দিবস। তার পরও কেটেছে প্রায় এক যুগ। উন্নত হয়েছে শিক্ষা। প্রযুক্তি। তবু সমাজের সর্ব স্তরের মানুষের মন থেকে এই ভুল ধারণা এখনও নির্মূল হয়েছে কি?

কলকাতায় ডিম দিবস উদ্‌যাপন

বিশ্ব ডিম দিবস

ডিমের গুণ, যত বলি ততই যেন কম। ডিমে আছে প্রোটিন। ডিমে আছে আমাদের শরীর-স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী বহু ভিটামিন, খনিজ। কেউ কেউ বলেন, জিশু খ্রিস্টের জন্মের সাড়ে সাত হাজার বছর আগে থেকেই নাকি মানুষ নিয়মিত ডিম খেয়ে চলেছে। এ-হেন গুণী খাদ্যকে সমাদর জানাতে প্রতি বছর অক্টোবরের দ্বিতীয় শুক্রবার বিশ্ব জুড়ে পালিত হয় বিশ্ব ডিম দিবস। এ বছর সেই দিনটা ১৩ অক্টোবর। আমাদের দেশেও ডিমের জন্য একটা দিন আছে। জাতীয় ডিম দিবস পালিত হয় ৩ জুন।

ভারতীয় দল

বিশ্বজয়ের স্বপ্নপূরণের পথে এক ধাপ

ভারতীয় দল বিশ্বজয়ের যোগ্য দাবিদার হিসেবেই শুরু করছে বিশ্বকাপ। দলের সিংহভাগ খেলোয়াড়ই স্বপ্নের ফর্মে... লিখেছেন **সায়ক বসু**

চার বছরের অপেক্ষার ইতি আজ থেকে। বিশ্বজয়ের লক্ষ্যে ঝাঁপাচ্ছে পৃথিবীর সেরা দশটি ক্রিকেট-খেলিয়ে দেশ। তবে যা হয়, আমরা তো চাইবই ভারত এ বার জগৎসভার শ্রেষ্ঠ আসনটা পাক। যদিও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলে দেওয়া যায়, কিছু দিন আগের এশিয়া কাপ এবং সদ্য সমাপ্ত অস্ট্রেলিয়া সফরে ভারতীয় দল ব্যাটে-বলে যে দুর্দান্ত ফর্ম দেখিয়েছে, সেটুকু ধরে রাখলে ২০১১ সালের পরে এ বার আবার স্বপ্নপূরণ হবে।

এই স্বপ্নপূরণের ক্ষেত্রে ভারত বাকিদের চেয়ে এগিয়ে আছে, কারণ গত কয়েক বছর ধরে যে ক'টি সমস্যা নিয়ে দল জর্জরিত ছিল, সেগুলো কাটিয়ে উঠেছে তারা। প্রথম থেকে শুরু করি। এই পরিসংখ্যানের সঙ্গে আবেগ এবং স্বপ্ন জড়িয়ে আছে। ভারত শুধু আয়োজক দেশ বলে বলছি না, কিন্তু দেখা যাচ্ছে, গত দু'টি বিশ্বকাপে যে দেশ বিশ্বকাপ আয়োজন করেছে, তারাই চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। সুতরাং সে দিক থেকে আশা তো রয়েছেই। তা ছাড়া ভারত এ বার আইসিসি র‍্যাঙ্কিংয়ে এক নম্বর দেশ হিসেবে বিশ্বকাপ খেলা শুরু করছে। তাই আশায়

শুভমন গিল

বুক বাঁধা যেতেই পারে।

সকলে ফর্মে... খুশির ব্যাপার

তবে সংখ্যার পরিসংখ্যান বলছে, এ বার রোহিত শর্মা এবং রাহুল দ্রাবিড়ের চিন্তার কারণ হতেই পারে প্রথম এগারোর জন্য দল তৈরি করা। কারণ মনে করা যাচ্ছে না, শেষ কবে গোটা ভারতীয় দলের প্রতিটি সদস্য এক সঙ্গে ফর্মে ফিরে বিশ্বকাপ খেলতে ঢুকেছে। গত বিশ্বকাপ থেকেই যে ব্যাপারটি ভারতকে সবচেয়ে বেশি ভাবিয়েছে, তা হল চার নম্বরের ব্যাটার। ২০১৯ সালের বিশ্বকাপে এই চার নম্বরের দাবিদার ছিলেন বেশ কিছু খেলোয়াড়। হার্দিক পাণ্ড্য, কে এল রাহুল, বিজয় শঙ্কর। মাঝের কয়েক বছরেও এই সমস্যার সমাধান হয়নি। এ বারও... মাস খানেক আগে রাহুল দ্রাবিড় চিন্তায় ছিলেন, চার নম্বর ব্যাটার কে হবেন? সেখানে কোহলি, শুভমন, সূর্যকুমার এবং ইশান কিশানকে নিয়েও আলোচনা হয়েছে। কিন্তু এ বার ভারতীয় দল একেবারে তৈরি। কে এল রাহুল চোট সারিয়ে দলে ফিরেই পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সেঞ্চুরি করেছেন। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে শ্রেয়স আইয়ারও বুঝিয়ে দিয়েছেন, কেন তিনি চার নম্বরের জন্য দেশের সবচেয়ে সক্ষম ব্যাটার। তা ছাড়া হার্দিক, ইশান এবং জাডেজা তো আছেনই। ফলে রোহিতকে চার-পাঁচে ব্যাটার বাছতে গেলে ফর্মে থাকা কোনও খেলোয়াড়কেই বেঞ্চে বসাতে হবে (স্পষ্ট করে বলতে গেলে, ইশান কিশান বা সূর্যকুমার যাদব)। রোহিত এর আগে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেছেন, প্রত্যেক খেলোয়াড়কেই দলে নিজের জায়গা এবং কাজ সম্পর্কে অবগত করে দেওয়া হয়েছে। প্রত্যেকেই জানেন, দলে তাঁদের কী দায়িত্ব এবং তাঁরা নির্দিষ্ট জায়গাতেই খেলবেন। ফলে আশা করা যায়, টিম ম্যানেজমেন্টের কাছে চূড়ান্ত ১১-ও এ ক্ষেত্রে তৈরি আছে।

হার্দিক পাণ্ড্য ও ইশান কিশান

কুলদীপ যাদব ও শুভমন গিল উল্লাসের মুহূর্তে

মহম্মদ সিরাজ

তবে হ্যাঁ, চার, পাঁচ এবং ছয় নম্বর ব্যাটাররা ম্যাচের পরিস্থিতি অনুযায়ী খেলবেন, এটা রোহিতেরই বক্তব্য।

দলের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় আশীর্বাদ হতে পারে, শেষ মুহূর্তে রবিচন্দ্রন অশ্বিনের অন্তর্ভুক্তি। অক্ষর পটেলের জন্য খারাপ লাগা খুব স্বাভাবিক। কারণ ভারতীয় দলে শেষ কয়েক বছরে ব্যাটে-বলে অভূতপূর্ব উন্নতি করেছিলেন অক্ষর। বাড়াবাড়ি মনে হতে পারে, কিন্তু এই মুহূর্তে রবীন্দ্র জাডেজার চেয়েও ভাল ফর্মে ছিলেন তিনি। কিন্তু জাডেজার প্রভাব তো চট করে অবহেলা করা যায় না! ভারত গত কয়েক বছর ধরেই ব্যাটিংয়ে গভীরতার কথা ভাবছে। তাই হয়তো প্রাথমিক পনেরো জনের দলে ডানহাতি স্পিন বোলারের বদলে অক্ষরের জায়গা হয়েছিল। কিন্তু শেষ মুহূর্তে চোট অক্ষরকে বাইরে পাঠিয়ে দিল। এবং ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টও প্রাথমিক ভাবে ডানহাতি স্পিনার না নিয়ে

রোহিত শর্মা এবং বিরাট কোহলি

রবিচন্দ্রন অশ্বিন

যে ভুলটা করেছিল, সেটা পুষিয়ে দিল রবিচন্দ্রন অশ্বিনকে দলে নিয়ে। অশ্বিনের মতো অভিজ্ঞ অলরাউন্ডার আসায় ভারতের ব্যাটিং গভীরতা অনেকটাই বাড়ল, সন্দেহ নেই। ডানহাতি স্পিনার আসায়, কুলদীপের পাশাপাশি স্পিন ভ্যারাইটিও থাকল। এতে হয়তো শার্দূল ঠাকুর দলে সুযোগ না-ও পেতে পারেন, কিন্তু কে অস্বীকার করবেন যে, শার্দূলের মতো উইকেট-টেকার অলরাউন্ডার গত এক বছরের ভারতীয় ক্রিকেটে বিরল! তাই তো বললাম, বিপক্ষ দল দেখে নিয়ে সেরা এগারো বাছতে হবে রোহিত-রাহুলকে। এবং সেটা খুব একটা সহজ হবে না। এটা আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ কারণ এ বার ভারত বিপক্ষ দলের শক্তি-দুর্বলতা অনুযায়ী বিভিন্ন মাঠে খেলবে। উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে, ভারত এ বার অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে খেলবে চেন্নাইয়ে। চেন্নাইয়ের মাঠের পিচ এমনিতেই একটু ধীর গতির। অস্ট্রেলিয়ার হেভিওয়েট ব্যাটারদের বিরুদ্ধে ধীর গতির পিচে যেমন স্পিনাররা কার্যকরী হবে, তেমনই আমদাবাদের পাটা পিচে খেলা হবে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে, যাতে শাহিন আফ্রিদি, হ্যারিস রউফের পেসকে সামলানো যায়। সত্যি বলতে কী, অশ্বিন আসায় দলের ভারসাম্য ভাল হয়েছে। এখন ভারত বিভিন্ন কম্বিনেশনে দল তৈরি করতে পারে। তাতে শক্তি যেমন থাকবে, থাকবে বৈচিত্রও।

সাম্প্রতিক ফর্মে শীর্ষে

লেখা শুরু করেছিলাম দলের খেলোয়াড়দের সাম্প্রতিক ফর্মের কথা বলে। সেটার বিশ্লেষণে যাই এ বার। কেন ভারত এ বার যে কোনও দলের কাছে ত্রাস হতে পারে। প্রথমেই বলতে

শ্রেয়স আইয়ার

হয় শুভমন গিলের কথা। ২০২৩ সাল শুভমন গিলকে এক জন তারকা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে গিয়েছে। আইপিএল এবং তিনটি ফরম্যাটের ক্রিকেটে গিল ব্যাট হাতে যে শাসন চালিয়েছেন, তাকে কুর্নিশ জানাতেই হয়। ইতিমধ্যে পঁচিশ বছরের কম বয়সি ব্যাটার হিসেবে সেঞ্চুরিতে বিরাট কোহলিকে ছাপিয়ে গিয়েছেন তিনি। ৬টি সেঞ্চুরি করার পর এখন সামনে শুধুই সচিন তেন্ডুলকর। এই বছর এক দিনের ক্রিকেটে

কে এল রাহুল

সবচেয়ে বেশি রান করে ফেলেছেন গিল। বলতে গেলে স্বপ্নের ফর্মে রয়েছেন তিনি। তিনি এবং রোহিত সাম্প্রতিক কালের অন্যতম সেরা ওপেনিং জুটি। তার পর বিরাট, ভারতীয় ক্রিকেটের বেতাজ বাদশা তো চাইবেনই ২০১১ সালের পরে ফের আবার বিশ্বকাপকে হাতে ছুঁয়ে দেখতে। রোহিত এবং বিরাট যে ফর্মে ফিরছেন, তার উদাহরণ কিন্তু এশিয়া কাপ এবং অস্ট্রেলিয়ার সিরিজ। বিশ্বকাপে রোহিত সব সময়ই ভাল খেলেন। এ বার দেশের মাটিতে হচ্ছে... সেটা বাড়তি সুবিধে। ইশান কিশান এবং সূর্যকুমার যাদবও পাওয়ার ক্রিকেট খেলে বুঝিয়ে দিয়েছেন, তাঁরা যে-কোনও সময় ম্যাচের রং বদলে দিতে পারেন। সূর্যকুমারের ব্যাট থেকে তো হালেই অস্ট্রেলিয়ার ক্যামেরন গ্রিন পর পর চারটি ছক্কা খেয়েছেন। এবং চোট সারিয়ে

জসপ্রীত বুমরা

দলে ফেরার পর হার্দিক একেবারে পুরনো মেজাজে ফিরে গিয়েছেন। শামি-সিরাজ-বুমরাহর সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে উইকেট তুলতে পারেন। পাশে তো রইলই অশ্বিন-কুলদীপের যুগলবন্দি। এক মাত্র সমস্যা হল রবীন্দ্র জাডেজার অফ-ফর্ম। তবে ওটা নিয়ে দল খুব একটা চিন্তিত বলে মনে হচ্ছে না। কারণ দেশের মাটিতে খেললে কনফিডেন্স ফিরেই পাবেন জাড্ডু। তাই আর কী, এ বার শুধু দরকার, বিপক্ষ অনুযায়ী সঠিক দল চয়ন। এবং যে ফর্মে সকলে রয়েছেন, তাতে আগামী ১৯ নভেম্বর রোহিতের হাতে

সূর্যকুমার যাদব

বিশ্বকাপ, পিছনে জাতীয় সঙ্গীত বাজছে... এই আবেগময় মুহূর্ত খুব কাছের বাস্তব বলেই মনে হচ্ছে।

ভারতের সম্ভাব্য ১১

রোহিত শর্মা
শুভমন গিল
বিরাট কোহলি
শ্রেয়স আইয়ার
কে এল রাহুল
হার্দিক পাণ্ড্য
রবীন্দ্র জাডেজা
রবিচন্দ্রন অশ্বিন/ শার্দূল ঠাকুর
কুলদীপ যাদব
মহম্মদ সিরাজ/ মহম্মদ শামি
জসপ্রীত বুমরা

ভ্রম সংশোধন: গত সংখ্যায় বিশ্বকাপ ২০২৩: স্টেডিয়াম তথ্য শীর্ষক প্রচ্ছদকাহিনিতে লেখা হয়েছে নরেন্দ্র মোদী স্টেডিয়ামে একটি সেমি ফাইনাল খেলা হবে। তথ্যটি ভুল। একটি সেমি ফাইনাল মুম্বইয়ে ও একটি কলকাতায় হবে। একই লেখায় ধরমশালার এইচপিসিএ স্টেডিয়ামের জায়গায় লেখা হয়েছে এইপিসিএ স্টেডিয়াম। অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য দুঃখিত।

আমাদের রাজ্য থেকে শুরু করে বিশ্বের নানা প্রান্তে ঘটছে খেলাধুলোর নানা ঘটনা। তার ঝলক থাকল এখানে।

সোনার মেয়ে শাকারি

শাকারি রিচার্ডসন

বিশ্ব অ্যাথলেটিক্সে স্প্রিন্টে জামাইকানদের দাপট বহু দিনের। দীর্ঘদিন পুরুষদের দ্রুততম স্থানটি ধরে রেখেছিলেন উসেন বোল্ট। বোল্ট অবসর নেওয়ার পরেও ট্র্যাক অ্যান্ড ফিল্ডে মেয়েদের আধিপত্য বজায় রেখেছিলেন শেলি-অ্যান ফ্রেজ়ার প্রাইস, শেরিকা জ্যাকসনরা। এ বারের বিশ্ব অ্যাথলেটিক্সে সব হিসেব উল্টেপাল্টে দিয়ে সংবাদের শিরোনামে উঠে এসেছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাকারি রিচার্ডসন। হাঙ্গেরির বুদাপেস্টে সম্প্রতি বিশ্ব অ্যাথলেটিক্সের মেয়েদের ১০০ মিটার দৌড়ে ১০.৬৫ সেকেন্ড সময় করে বিশ্বের দ্রুততম মানবীর খেতাব জিতে নিয়ে নজর কেড়ে নিয়েছেন তেইশ বছরের এই মার্কিন অ্যাথলিট। ৫ বারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন শেলি-অ্যান ফ্রেজ়ার প্রাইস পেয়েছেন তৃতীয় স্থান। অন্য জামাইকান প্রতিদ্বন্দ্বী শেরিকা পেয়েছেন দ্বিতীয় স্থান। অথচ ২০২০ টোকিয়ো অলিম্পিক্সের আগে ট্রায়ালে ভাল ফল করেও ডোপিং-বির্তকে জড়িয়ে টোকিয়োগামী মার্কিন দল থেকে বাদ পড়েছিলেন শাকারি। ঘুরে দাঁড়াতে সময় লাগলেও তিনি হারিয়ে যাননি। মাদক-বির্তকের কলঙ্ক পিছনে ফেলে তিনিই এখন সোনার মেয়ে। এই বিশ্বের দ্রুততম মহিলা অ্যাথলিট।

জোকোভিচের চোখে প্যারিস

আগামী বছর জুলাইয়ে প্যারিস অলিম্পিক্স। প্যারিসে টেনিসে সোনা জয়ের লক্ষ্য নিয়েই এ বার এগোতে চান নোভাক জোকোভিচ। বয়স ছত্রিশ। তবে কোর্টে নামলে দেখে মনে হয় সদ্য পঁচিশে পা রাখা তরুণ। সার্বিয়ান টেনিস কিংবদন্তি নোভাক জোকোভিচের বয়স যত বাড়ছে, ততই যেন তিনি আগুনে ফর্ম নিয়ে কোর্ট ঝাঁপিয়ে পড়ছেন। উইম্বলডন টেনিসের ফাইনালে কার্লোস আলকারাজ়ের কাছে হেরে গেলেও যুক্তরাষ্ট্র ওপেনে দানিল মেদভেদভকে হারিয়ে জোকোভিচ চতুর্থ বার যুক্তরাষ্ট্র ওপেন জিতে ছুঁয়ে ফেলেছেন মার্গারেট কোর্টের সর্বাধিক চব্বিশটি গ্র্যান্ড স্ল্যাম জয়ের নজির। গত দু'বছর যুক্তরাষ্ট্র ওপেনে নামার সুযোগ পাননি। কোভিডের টিকা না নেওয়ায় মার্কিন দেশে প্রবেশাধিকার পাননি। এ বার সুযোগ মিলতেই বড় জয় তুলে নিয়েছেন। ২০০৮ সালে বেজিং অলিম্পিক্সে ব্রোঞ্জ জিতেছিলেন। এর পরে লন্ডন, রিয়ো এবং টোকিয়ো অলিম্পিক্সে সোনা জিততে পারেননি। প্যারিসে জীবনের শেষ অলিম্পিক্সে সেই অধরা খেতাব জিততে চান জোকোভিচ।

নোভাক জোকোভিচ

প্যারিসের ছাড়পত্র পেলেন অন্তিম

অন্তিম পাঙঘাল

ভারতের প্রথম কুস্তিগির হিসেবে ২০২২ ও ২০২৩, পর পর দু'টি অনূর্ধ্ব কুড়ি বিশ্ব কুস্তি চ্যাম্পিয়নশিপে ৫৩ কেজি বিভাগে সোনা জিতে ইতিহাস গড়ে ফেলা মেয়ে অন্তিম পাঙঘাল এ বার আগামী বছরের প্যারিস অলিম্পিক্সে দেশের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করার টিকিট পেয়ে গেলেন। বিশ্ব কুস্তি প্রতিযোগিতায় ১৬-৬ ফলে সুইডেনের জোন্না মামগ্রেনকে উড়িয়ে দিয়ে অলিম্পিক্সের যোগ্যতা অর্জন করেন হরিয়ানার হিসারের উনিশ বছরের এই মহিলা কুস্তিগির। পরিবারের চতুর্থ সন্তানও মেয়ে। বাবা রাম নিবাস পাঙঘাল ও মা কৃষ্ণা কুমারী শেষ শিশুকন্যার নাম রাখলেন 'অন্তিম'। সেই অন্তিমের চোখেই এখন অলিম্পিক্সে পদক জয়ের স্বপ্ন।

অভিষেকেই ইয়ামালের নজির

লামিন ইয়ামাল

ক্লাব ফুটবলে অভিষেক ম্যাচেই নজির গড়েন। এ বার দেশের জার্সি গায়ে প্রথম আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলতে নেমেও সবচেয়ে কম বয়সি ফুটবলার হিসেবে নতুন নজির গড়লেন স্পেনের উঠতি ফুটবলার লামিন ইয়ামাল। গত এপ্রিলে বার্সেলোনার হয়ে রিয়াল বেটিসের বিরুদ্ধে পনেরো বছর দুশো নব্বই দিন বয়সে খেলতে নেমে বার্সার হয়ে লা লিগায় সর্ব কনিষ্ঠ ফুটবলার হিসেবে খেলার নজির গড়েছিলেন তিনি। বার্সার হয়ে লিয়োনেল মেসির অভিষেক হয়েছিল আঠারো বছরে। ইয়ামালের আগে এত দিন বার্সার হয়ে প্রথম একাদশে ষোলো বছর বয়সে সবচেয়ে কম বয়সি খেলোয়াড় হিসাবে মাঠে নেমেছিলেন আনসু ফাতি। সেই ইয়ামালই এ বার ষোলো বছর সাতান্ন দিন বয়সে স্পেনের হয়ে জর্জিয়ার বিরুদ্ধে জীবনের প্রথম আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলতে নেমে ইতিহাস গড়লেন। ইউরো কাপের যোগ্যতা অর্জনের লড়াইয়ে জর্জিয়াকে ৭-১ গোলে হারায় স্পেন। অভিষেক ম্যাচেই চুয়াত্তর মিনিটে স্পেনের হয়ে ৭ নম্বর গোলটি করেন ইয়ামাল। তাঁর আগে স্পেনের জাতীয় দলের হয়ে মাঠে নামা কনিষ্ঠ ফুটবলার ছিলেন বার্সেলোনায় খেলা তাঁরই সতীর্থ ফুটবলার গাবি।

ফেরার লড়াইয়ে হালেপ

ডোপ পরীক্ষায় ব্যর্থ হয়ে টেনিস কোর্ট থেকে ৪ বছরের জন্য নির্বাসিত হয়েছেন সিমোনা হালেপ। গত বছর যুক্তরাষ্ট্র ওপেনের সময় নিষিদ্ধ ওষুধ নেওয়ার কারণে ডোপ পরীক্ষায় অভিযুক্ত হন বিশ্বের প্রাক্তন এক নম্বর, রোমানিয়ার বত্রিশ বছরের এই মহিলা টেনিস-তারকা। দ্বিতীয় নমুনাতেও তাঁর শরীরে নিষিদ্ধ ওষুধের উপস্থিতি ধরা পড়ে। এর পরই আন্তর্জাতিক টেনিস সংস্থা জানিয়ে দেয়, আগামী ২০২৬ সালের ৬ অক্টোবর পর্যন্ত নির্বাসিত হলেন হালেপ। আন্তর্জাতিক টেনিস দুনিয়া থেকে চার-চারটি বছর নির্বাসন কম কথা নয়। দু'বারের গ্র্যান্ড স্ল্যাম চ্যাম্পিয়ন হালেপ। ২০১৮ সালে ফ্রেঞ্চ ওপেন জয়ের পর ২০১৯ সালে জেতেন উইম্বলডন। গত বছরের অক্টোবর থেকেই প্রাথমিক ভাবে নির্বাসনে তিনি। যদিও এই রায় মানতে নারাজ হালেপ। তাঁর কথায়, "গত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ওপেনের পর থেকে আমি এক কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে চলেছি। খুবই দুর্ভাগ্যজনক ভাবে চলেছে আমার লড়াই। সারা জীবন নিয়ম মেনে চলেছি। জেনেশুনে কোনও ওষুধ আমি খাইনি।" এই রায়ের বিরুদ্ধে এ বার কোর্ট অফ আর্বিট্রেশন ফর স্পোর্টসে আবেদন করার কথা ভাবছেন হালেপ।

সিমোনা হালেপ

আর্সেন ওয়েঙ্গার

ওয়েঙ্গারের নজরে ভারতীয় ফুটবল

চলতি মাসেই কিংবদন্তি ফরাসি কোচ আর্সেন ওয়েঙ্গারের ভারতে আসার কথা। এক সময়ের তারকা কোচ এখন ফিফার গ্লোবাল ফুটবল ডেভেলপমেন্টের প্রধান। দীর্ঘ বাইশ বছর তিনি ছিলেন ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের ক্লাব আর্সেনালের কোচ। তাঁর হাত ধরেই বহু সাফল্য পেয়েছে আর্সেনাল। এমিরেটস স্টেডিয়ামের বাইরে বসেছে তাঁর মূর্তি। পুরো নাম আর্সেন চার্লস আর্নেস্ট ওয়েঙ্গার। সর্ব ভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন উদ্যোগী হওয়ায় তিয়াত্তর বছরের এই কিংবদন্তি কোচ ফিফার প্রতিনিধি হিসেবে ভারতে আসছেন। ভারতীয় ফুটবলের উন্নতিতে এ দেশে কাজ করতে চান তিনি।

তাহুরার মনে অলিম্পিক্সের স্বপ্ন

তাহুরা খাতুন
ফটো: লেখক

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার ভাঙরের প্রত্যন্ত গ্রাম পশ্চিম ধারাপাড়ার এক প্রান্তিক পরিবারের মেয়ে তাহুরা খাতুন। বাবা মীর তৈয়েব আলি মূলত ভাগচাষী। দাদা মীর আলমগীর হোসেন স্থানীয় একটি স্কুলের আংশিক সময়ের শিক্ষক। সামান্য আয়ের পরিবারের মেয়ে তাহুরা এই মুহূর্তে বাংলার অ্যাথলেটিক্সের পরিচিত মুখ। সদ্য ৭১তম রাজ্য অ্যাথলেটিক্সে ২০০ ও ৪০০ মিটার দৌড়ে জোড়া সোনা জিতে নজর কেড়েছেন তাহুরা। এই সাফল্যে তাঁর হাতে দ্বিতীয় বার 'সত্যরঞ্জন রায় মেমোরিয়াল অ্যাওয়ার্ড' তুলে দেয় অ্যাথলেটিক্স কোচেস অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গল। সঙ্গে আড়াই হাজার টাকার আর্থিক পুরস্কার। তাল গাছ, নারকেল গাছে চড়া তাহুরার ছেলেবেলা থেকেই খেলাধুলোর প্রতি আগ্রহ ছিল। ছেলেদের সঙ্গে ফুটবল, ক্রিকেট খেলতে দেখে ভাঙড় হাই মাদ্রাসার শিক্ষক বাগবুল ইসলাম তাহুরাকে প্রথম মাঠে নিয়ে যান। পরে বাংলার প্রাক্তন অ্যাথলিট মীরাতুন নাহারের কাছে শুরু হয় অ্যাথলেটিক্স চর্চা। ওই মাদ্রাসাতেই এখন দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রী তাহুরা। ২০১৯ সালে রাজ্য স্কুল গেমসে জিতেছিলেন জোড়া সোনা। অসমের গুয়াহাটিতে ২০২১ সালে জাতীয় জুনিয়র অ্যাথলেটিক্সে ৬০০ মিটারে আছে সোনা জয়ের কৃতিত্ব। গত বছর বিহারে পূর্বাঞ্চল অ্যাথলেটিক্সে দু'টি ব্যক্তিগত ও একটি দলগত সোনাজয়ী এই উঠতি অ্যাথলিট এই মুহূর্তে কলকাতার সাই কেন্দ্রের শিক্ষার্থী। কোচ সঞ্জয় ঘোষের কাছে চলছে সকাল-বিকেল অনুশীলন। সামনেই ঝাড়খণ্ডে ওপেন ন্যাশনাল। তাহুরার কথায়, "আমার স্বপ্ন অলিম্পিক্সে অংশ নেওয়া।" দাদা আলমগীর বলছেন, "প্রত্যন্ত গ্রাম-গঞ্জ থেকে তাহুরার মতো লড়াই করে উঠে আসা ছেলেমেয়েদের দিকে সরকারের একটু নজর- দেওয়া দরকার।"

চন্দন রুদ্র

নতুন খেলা

১

৩

২

৪

ডি	সে	স্ব	র
গ	ণ	প	তি
বা	গ্	দে	বী
জি	ভ	ছো	লা

ছবিতে শব্দ খোঁজো

চারটি ছবি দেওয়া আছে। ছবি দেখে সেগুলোর বাংলা নাম পর পর খোপে লিখে ফ্যালো। এ বার সেই শব্দগুলোর প্রথম অক্ষর দিয়ে তৈরি হবে একটি বিশেষ শব্দ। শব্দটি তোমাদের পরিচিতই। পেলে খুঁজে?

এ বারের সঙ্কেত : আগুন নেভানোর কাজ করে যে সংস্থা।

৫ সেপ্টেম্বর সংখ্যার সমাধান :

ডি গ বা জি

Go Figure

খোপের নীচে দেওয়া চারটি সংখ্যা যেমন খুশি প্রথম, তৃতীয়, পঞ্চম এবং সপ্তম খোপে বসাও। যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগের মধ্যে যে-কোনও চিহ্ন বসাও দ্বিতীয়, চতুর্থ এবং ষষ্ঠ খোপে। যাতে অঙ্কটি কষলে ডান দিকে দেওয়া সংখ্যাটি তার ফল হয়। চারটি সংখ্যা একবারই ব্যবহার করবে। মনে-মনে বন্ধনীও ব্যবহার করতে পার। এই ধাঁধার একাধিক উত্তর হতে পারে।

৫ সেপ্টেম্বর সংখ্যার সমাধান :

সহজ : ৭ + ৩ − (৬ − ৪) = ৮

মাঝারি : (১৩ × ৩) − (৪ + ৫) = ৩০

কঠিন : (৪ × ৮) ÷ (১৫ + ১) = ২

উপর-নীচ দুটো বিভাগের সঠিক উত্তর ১৫ অক্টোবর-এর মধ্যে anandamelamagazine@gmail.com ঠিকানায় পাঠালে তবেই সঠিক উত্তরদাতা হিসেবে তোমাদের নাম উঠবে।

অদৃতা মজুমদার, *সপ্তম শ্রেণি, দ্য সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুল, মালদা।* **বৈশালী পোদ্দার**, *অষ্টম শ্রেণি, অগজ়িলিয়াম কনভেন্ট স্কুল, ব্যান্ডেল।* **বিতান পোদ্দার**, *সপ্তম শ্রেণি, ডন বস্কো স্কুল, ব্যান্ডেল।* **রাজর্ষি সাহা**, *ষষ্ঠ শ্রেণি, রামকৃষ্ণ মিশন বালকাশ্রম রহড়া উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়।* **রিত্বিষা পাত্র**, *সপ্তম শ্রেণি, সেন্ট জোসেফ্স কনভেন্ট, চন্দননগর, হুগলি।* **অদ্রীশ মাইতি**, *চতুর্থ শ্রেণি, সরস্বতী শিশু মন্দির, বক্সীবাজার, মেদিনীপুর।* **আর্য দে**, *অষ্টম শ্রেণি, যোধপুর গার্লস হাই স্কুল, কলকাতা।* **শিবকৃষ্ণ দাশ**, *অষ্টম শ্রেণি, কন্টাই পাবলিক স্কুল, পূর্ব মেদিনীপুর।* **সপ্তক ঘোষ**, *ষষ্ঠ শ্রেণি, বোলপুর হাই স্কুল, বীরভূম।* **পরমব্রত পাল**, *সপ্তম শ্রেণি, ওরিয়েন্টাল পাবলিক স্কুল, কল্যাণী, নদিয়া।*